ত্রিপুরা রাজ্য
মাইল
০ ১০ ২০
সীমানা
রাজধানী
মহকুমা সদর
আগরতলা
মানুমুখ
কুলাউরা
শিলুয়া
কুর্তি
দুর্লভছড়া
লইরপোয়া
কেক্সাগুল
ইটনা
আজমীরীগঞ্জ
নবীগঞ্জ
বাণিয়াচং
মৌলবী বাজার
ব্রজেন্দ্রনগর
রাজকী
ধর্মনগর
মিতামইন
হবিগঞ্জ
মাদনা
সায়েস্তাগঞ্জ
কৈলাসহর
কালীঘাট
আদমপুর
দামছড়া
নাসিরনগর
কমলপুর
ফটিকরায়
আজবপুর
বাল্লা
খোয়াই
মানপুই
আশুগঞ্জ
চান্দুরা
ধর্মগড়
ভ্যাঙ্গমুন
ব্রাহ্মণবাড়িয়া
বামুটিয়া
কল্যাণপুর
আমবাসা
বাহাদুরপাড়া
নারায়ণপুর
আখাউড়া
বাণীববাজার
ফুলদংশি
বিশালগড়
অম্পিবাজার
সাইথা
বাথানবাড়ী
শিলচরিবাজার
জাফরগঞ্জ
লাংটিয়ান
উদয়পুর
অমরপুর
নিরমহল
রুদ্রসাগর
ময়নামতি
মাতারবারী
মহারাণীবাজার
কুমিল্লা
সোনামুড়া
নতুনবাজার
বরুরা
কাঠালিয়া
লাওপাংবাজার
লাকসাম
বিলোনিয়া
কলসীবাজার
লংথুং
চৌদ্দগ্রাম
দেওয়ানবাজার
মনুবাজার
সোনাইমুড়ি
ছাগলনাইয়া
অযোধ্যা বাজার
ফেনী
সাব্রুম
উপেন্দ্রনগর
রামগড়
বেগমগঞ্জ
ডাগানভুঁইয়া
জোরাওয়ারগঞ্জ
সোনাগাজী
নোয়াখালী জেলা
চট্টগ্রাম জেলা
শ্রীহট্ট জেলা
ময়মনসিংহ জেলা
ত্রিপুরা জেলা
কাছাড় জেলা
আঠারমুড়া
বড়মুড়া
দেবতামুড়া
লংতরাই
২৪°
২২°
৯১°
৯২°

# ত্রিপুরার ইতিকথা



প্রভাস দত্ত

ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানি
৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ : শ্রাবণ, ১৩৬৫

প্রচ্ছদ শিল্পী : ধীরেন বল

দাম : দুই টাকা

শ্রীপ্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক কর্তৃক ৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে প্রকাশিত ও শ্রীধনঞ্জয় প্রামাণিক কর্তৃক সাধারণ প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড, ১৫এ, ক্ষুদিরাম বোস রোড, কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত

বাবা ও বাবুকে—

# লেখকের নিবেদন

সরকারী কার্যোপলক্ষে একাদিক্রমে কয়েক বৎসর ত্রিপুরা থাকার সৌভাগ্য হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের 'রাজর্ষি' পাঠ করিয়া এই অরণ্য-রাজ্য সম্পর্কে কৌতূহল জন্মিয়াছিল। ত্রিপুরা আসার সুযোগ পাইয়া, ইহার সুপ্রাচীন ইতিহাসের লিখিত ও অলিখিত কাহিনী যতটুকু পারিয়াছি সংগ্রহ করার চেষ্টা করিয়াছি। অভিজ্ঞ কোন লেখকের হাতে পড়িলে এই বিচিত্র উপাদান দ্বারা একটি মূল্যবান গ্রন্থ রচিত হইতে পারিত। ইহার উপযুক্ত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা আমার নাই— ইহা বলাই বাহুল্য। এই হেতু বন্ধুজনের উৎসাহদান সত্ত্বেও ত্রিপুরা সম্পর্কে একটি পূর্ণাবয়ব পুস্তক রচনার লোভ সংবরণ করিয়াছি। "ত্রিপুরার ইতিকথা" ত্রিপুরার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাসের মর্যাদা দাবী করিতে পারে না। প্রকৃত পক্ষে প্রাচীন ইতিহাস অপেক্ষা বর্তমান কালের আলোচনাই ইহাতে বেশী স্থান পাইয়াছে। তথাপি বিস্মৃতির পর্দা সরাইয়া অতীত দিনের যতটুকু কাহিনী জানিতে পারিয়াছি, তাহার মোটামুটি পরিচয় দিবার চেষ্টা করিয়াছি। এই প্রচেষ্টা কতখানি সার্থক হইয়াছে তাহা অবশ্য তথ্যাভিজ্ঞ পাঠকদের বিচার্য। তবে জ্ঞাতসারে ইতিহাসের কোন তথ্য বিকৃত করি নাই—লেখক হিসাবে সবিনয়ে এই আশ্বাস দিতে পারি। আমার প্রথম নিবেদন ইহাই।

গোড়ায় কেবলমাত্র স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের জন্য বইটি লেখা আমার উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পূর্বসংকল্প পরিত্যাগ করিয়া

বইটিকে সাধারণ পাঠোপযোগী করবার চেষ্টা করিয়াছি। ফলে রচনা-রীতিতে কিছু অসঙ্গতি দেখা দিয়াছে। এই জন্য ক্রটি স্বীকার ছাড়া আমার কোন কৈফিয়ৎ দিবার নাই। ভবিষ্যতে সুযোগ হইলে এই ক্রটি সংশোধনের চেষ্টা করিব। এই প্রসঙ্গে ইহাই আমার দ্বিতীয় নিবেদন।

লেখা ব্যাপারে ত্রিপুরা আঞ্চলিক পরিষদের অধ্যক্ষ শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ, ত্রিপুরা প্রশাসনের প্রাক্তন উপদেষ্টা শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত, পিতৃতুল্য শ্রদ্ধাভাজন শ্রীদ্বিজেন্দ্রচন্দ্র দত্ত ও শ্রীসত্যরঞ্জন বসু প্রথম হইতে আমাকে নানাভাবে উৎসাহ ও উপদেশ দান করিয়াছেন। তাঁহাদের নিকট আমার ঋণ অপরিশোধ্য। তাঁহারা ছাড়া অধ্যাপক শ্রীসুবোধ চৌধুরী ও শ্রীজলদবরণ গাঙ্গুলী, সাংবাদিক শ্রীশৈলেশ সেন, শ্রীনিরঞ্জন বানার্জী ও শ্রীবীরেশ চক্রবর্তী, শিল্পী শ্রীনলিনী মজুমদার, শ্রীশান্তি দাশগুপ্ত প্রভৃতি বন্ধুবর্গ এবং ত্রিপুরাস্থ আমার অনেক প্রাক্তন সহকর্মীর নিকট হইতেও মূল্যবান সাহায্য পাইয়াছি। প্রকাশক বন্ধু শ্রীপ্রহ্লাদকুমার প্রামাণিকের অকুণ্ঠ সাহায্য ছাড়া আমার পক্ষে এই বই লেখা সম্ভব হইত না। বস্তুতঃ এই বই-এর জন্য যদি কোন কৃতিত্ব পাওনা থাকে তবে তাহা প্রহ্লাদবাবুরই প্রাপ্য।

পুস্তকের সমুদয় চিত্র শ্রীসুখালাল দের তোলা। ত্রিপুরা-ভ্রমণে তিনি আমার প্রায় নিত্য-সঙ্গী ছিলেন।

—লেখক

# বিষয়-সূচী

# ত্রিপুরার ইতিকথা

## প্রথম অধ্যায়

### সূচনা

গ্রীক-সম্রাট আলেকজেণ্ডার সিন্ধু নদের তীরে দাঁড়াইয়া বিস্ময়-বিমুগ্ধ চিত্তে বলিয়াছিলেন: "কী বিচিত্র এই দেশ!" সত্যই বৈচিত্র্যময় দেশ আমাদের ভারতবর্ষ। একবার মনে মনে এই বিপুল উপ-মহাদেশের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য স্মরণ কর। একদিকে যেমন রহিয়াছে সুজলা সুফলা বঙ্গভূমি, তেমনি আছে রাজপুতানার রুক্ষ কঠিন মরুভূমি। পিতৃ-হৃদয়ের উদার গাম্ভীর্য লইয়া একদিকে যেমন দেবতাত্মা হিমালয় দণ্ডায়মান, অন্যদিকে জননীর উদ্বেলিত স্নেহের মত মহাসাগরের বিশাল জলরাশি বিস্তৃত বেলাভূমিকে আলিঙ্গনবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। আর বহু সভ্যতার মিলন-ধন্য এই ভারত-তীর্থে কত বিচিত্র মানুষের মেলা! একের মধ্যে বহু, বহুর মধ্যে এক—ভারতীয় সভ্যতার মর্মবাণী ইহাই। এই বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করিয়া স্বাধীন ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় আদর্শকে রূপ দেওয়া হইয়াছে। বহু রাজ্যের সম্মেলনে তাই গঠিত হইয়াছে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র।

ত্রিপুরা ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত একটি রাজ্য। বাঙলা, বোম্বাই প্রভৃতি রাজ্যের সমান মর্যাদাসম্পন্ন না হইলেও ভারত-

বর্ষের নূতন রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় ত্রিপুরার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য স্বীকৃত। ইহা আমাদের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে অবস্থিত। এই রাজ্যকে উপদ্বীপের সঙ্গে তুলনা করা যায়। উপদ্বীপ বলিতে কী বোঝায়? তিন দিকে জলদ্বারা বেষ্টিত ভূমিখণ্ডকে উপদ্বীপ বলে। ত্রিপুরার ভৌগোলিক অবস্থান কি অনুরূপ? না, তাহা নহে। তবে ইহাকে উপদ্বীপের সঙ্গে তুলনা করার হেতু কি? মানচিত্রেব দিকে তাকাইলেই ইহার কারণ বোঝা যাইবে।

পূর্ব-পাকিস্তানের চারিটি জেলা উত্তর-পশ্চিম, পশ্চিম, দক্ষিণ-পূর্ব এবং দক্ষিণ দিক হইতে ত্রিপুরাকে ঘিরিয়া রাখিয়াছে। মাত্র উত্তর ও উত্তর-পূর্ব দিকে ভারতবর্ষের মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে এই রাজ্যের সংযোগ রহিয়াছে। সহজ কথায়, তিন দিক হইতে সাতশত কুড়ি মাইল সীমান্ত জুড়িয়া ত্রিপুরা পূর্ব-পাকিস্তান দ্বারা বেষ্টিত। পাকিস্তান বিদেশী রাষ্ট্র, এই কথা স্মরণ রাখিলে ত্রিপুরা রাজ্যকে উপদ্বীপের সঙ্গে তুলনা করার তাৎপর্য অনুভব করা সহজ হইবে।

ত্রিপুরার মোট আয়তন চারি হাজার বর্গমাইলের কিছু বেশী। ১৯৫১ সালের সেন্সাস হিসাবে বিভিন্ন ভাষা-ভাষী প্রায় সাড়ে ছয় লক্ষ লোক এই রাজ্যে বাস করে।

আয়তনের দিক হইতে ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় ক্ষুদ্র হইলেও ত্রিপুরা এক প্রাচীন গৌরবময় ইতিহাসের অধিকারী। আমরা যে স্থানে জন্মিয়াছি, যাহার ধূলিমাটি দেহে মাখিয়া বড় হইয়াছি, সেই স্থানের ইতিহাস জানিতে কাহার না আগ্রহ হয়? এই সুদীর্ঘ ইতিহাসের পর্বে পর্বে যে সকল কাহিনী আমাদের

পূর্ব-পুরুষদের অতীত মহিমার সাক্ষ্য বহন করিতেছে, তাহা পাঠ করিয়া কে না গৌরব বোধ করিবে?

সুদূর অতীত কালে ভারতবর্ষের ইতিহাসের কোন্ বিস্মৃত অধ্যায়ে ত্রিপুরা রাজ্যের উদ্ভব হইয়াছিল তাহা সঠিক জানা যায় না। বিগত ছয়-সাত শত বৎসরের ইতিহাস অবশ্য পাওয়া যায়। দেশী ও বিদেশী বিভিন্ন লেখকের লেখায়, প্রাচীন শিলালিপি, তাম্র শাসন ও মুদ্রা ইত্যাদিতে এই ইতিহাসের নির্ভরযোগ্য উপাদান ছড়াইয়া আছে।

# দ্বিতীয় অধ্যায়

## ইতিহাসের কাহিনীঃ আদিপর্ব

ইতিহাসের পৃষ্ঠা অতীতের দিকে উল্টাইয়া গেলে চন্দ্রবংশীয় রাজা যযাতির সাক্ষাৎ পাওয়া যাইবে। প্রবাদ আছে, এই পৌরাণিক ভূপতির তৃতীয় পুত্র দ্রুহ্যু ত্রিপুরা-রাজবংশের আদি পুরুষ। কিংবদন্তী অনুসারে যযাতি দৈত্যগুরু শুক্রাচার্যের অভিশাপে অকালে জরাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অভিশপ্ত রাজা একে একে সকল পুত্রকে স্বীয় জরা গ্রহণ করিতে অনুরোধ জানাইলে কনিষ্ঠ পুত্র পুরু ছাড়া আর কেহই পিতার প্রস্তাবে সম্মত হন নাই। ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া যযাতি পুরুকে রাজ্যের উত্তরাধিকারী নির্বাচনপূর্বক অবাধ্য পুত্রদিগকে নির্বাসিত করিয়াছিলেন। এই ভাবে নির্বাসন-প্রাপ্ত হইয়া দ্রুহ্যু সাগরদ্বীপে সাংখ্যদর্শন-প্রণেতা কপিলমুনির অনুগ্রহে ত্রিবেগ নামে এক রাজ্য স্থাপন করেন।

এই সম্পর্কে আর একটি কাহিনী প্রচলিত আছে। দ্রুহ্যু যযাতির ইচ্ছার বিরুদ্ধে বড়ো ( Bodo ) জাতীয় এক অনার্য রাজকুমারীকে বিবাহ করার অপরাধে পিতার আদেশে নির্বাসিত হইয়াছিলেন। পিতৃরাজ্য পরিত্যাগ করিয়া দ্রুহ্যু বর্তমান এলাহাবাদের নিকট এক নূতন রাজ্য স্থাপন করেন। বড়ো জাতি পূর্বে মধ্য-এশিয়ায় বসবাস করিত।

উপরোক্ত উভয় কাহিনী অনুসারে যযাতি-পুত্র দ্রুহ্যু ত্রিপুরার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া স্বীকৃত।

খ্রীষ্টপূর্ব আনুমানিক ১৯০০ অব্দে প্রতর্দন নামে এক পরাক্রমশালী রাজা বর্তমান আসামের নওগাঁও জেলায় কপিলি ( ব্রহ্মপুত্র ) নদীর তীরে এক নূতন রাজধানী স্থাপন করেন। তৎকালে এই স্থান কিরাত রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। মহাভারতে কিরাতদের উল্লেখ রহিয়াছে। নূতন রাজ্যগঠনের পরও বহুকাল পর্যন্ত রাজধানী পুরাতন ত্রিবেগ নামেই খ্যাত ছিল। কথিত আছে, ত্রিবেগের দ্বাদশ রাজা চিত্ররথ সম্রাট যুধিষ্ঠিরের আমন্ত্রণে হস্তিনাপুরে অনুষ্ঠিত রাজসূয় যজ্ঞে যোগদান করিয়াছিলেন।

পঞ্চদশ রাজা ত্রিপুর পরাক্রান্ত হইলেও অধার্মিক ছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে রাজ্যমধ্যে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। অসন্তুষ্ট প্রজাগণ রাজাকে হত্যা করিয়া পুত্র ত্রিলোচনকে সিংহাসন প্রদান করেন। দাম্ভিক ত্রিপুর নিজের নামানুসারে রাজ্যেব নাম "ত্রিপুরা" রাখিয়াছিলেন ইহাই সাধারণ বিশ্বাস। মতান্তরে "তুই" ও "প্রা" এই দুই শব্দের সহযোগে প্রথমে তুইপ্রা এবং কালক্রমে ত্রিপুরা নামের উৎপত্তি হইয়াছে। ত্রিপুরা ভাষায় "তুই" শব্দের অর্থ জল এবং "প্রা" মানে সমুদ্র। এককালে ত্রিপুরা রাজ্য সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সে যাহাই হউক, ত্রিলোচন রাজা হইয়া রাজ্যের শক্তি ও সীমা প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি করেন। তাঁহার রাজত্বকালে ত্রিপুরা রাজ্য কতদূর বিস্তার লাভ করে তাহা সঠিক জানা যায় না। সুশৃঙ্খল ত্রিপুব-সৈন্যের পুনঃ পুনঃ আক্রমণে প্রতিবেশী পার্বত্য গোষ্ঠীর অনেকেই বশ্যতা স্বীকার করিলেও মণিপুর, কাছাড় ও জয়ন্তীয়া রাজাদের শক্তি তুলনায় কম ছিল না।

ইহা হইতে অনুমান করা যায় যে, বর্তমান কাছাড় জেলার সমস্ত

অংশ, লুসাই পাহাড়, করিমপুর, দক্ষিণ-শ্রীহট্ট এবং পার্বত্য-ত্রিপুরা ত্রিপুরা রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

ত্রিলোচন শুধু পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন না, কৌশল ও বিচক্ষণতা দ্বারা ত্রিপুরার রাজশক্তি সংহত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। প্রতি-বেশী কাছাড়ের রাজদুহিতাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিয়া তিনি দূরদৃষ্টির পরিচয় দিয়াছিলেন। অবশ্য এই বিবাহ দ্বারা কাছাড় ও ত্রিপুরার মধ্যে বন্ধুত্ব দীর্ঘস্থায়ী হয় নাই। ববং ত্রিলোচনের মৃত্যুর পর এই বিবাহ-সূত্রে দুই রাজ্য পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়।

ত্রিলোচনের দুই পুত্র ছিলেন। জ্যেষ্ঠ দৃকপতি অপুত্রক পিতামহের মৃত্যুর পর কাছাড়ের সিংহাসন লাভ করেন। এই হেতু পিতার অবর্তমানে কনিষ্ঠ পুত্র দক্ষিণ ত্রিপুরার রাজা হন। কিন্তু দৃকপতি ইহাতে আপত্তি জানাইয়া পিতৃরাজ্য দাবী করিয়া বসিলেন। ফলে দুই রাজ্যে যুদ্ধ অনিবার্য হইয়া উঠিল। অস্ত্র-পরীক্ষায় পরাজিত হইয়া ত্রিপুরাধিপতি স্বীয় সৈন্যগণ সহ দক্ষিণ দিকে পলায়নপূর্বক বরবক্র বা বরাক নদীর তীরে বর্তমান শিলচরের নিকট রাজ্য স্থাপন করেন।

বহুকাল শান্তিতে রাজত্ব করার পর ৪৯০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে কাছাড়ের সঙ্গে ত্রিপুরার পুনরায় বিবাদ উপস্থিত হইল। যুদ্ধে পরাজিত হইয়া ত্রিপুরাধিপতি প্রতীত জুরি নদীর তীরবর্তী ধর্মনগরে রাজধানী স্থানান্তরিত করিতে বাধ্য হন।

প্রতীতের পরবর্তী উল্লেখযোগ্য রাজা হিমতি বা যুঝারু-ফা। তিনি ৫৯০ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসন আরোহণ করেন। হিমতি পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়া নিজ রাজ্যের বিস্তার

সাধন করেন। তাঁহার সময় রাজধানী রাঙ্গমাটি স্থানান্তরিত হয়। স্বীয় শাসনকাল স্মরণীয় করার উদ্দেশ্যে তিনি ত্রিপুরাব্দের প্রবর্তন করেন।

হিমতির পর ত্রিপুরা-ইতিহাসের আদিপর্বে কিরীট অথবা আদি ধর্ম-ফা ছাড়া আর কোন রাজা সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত আসামে ঐতিহাসিক গবেষণা-সংক্রান্ত বিবরণীতে দুইটি তাম্রলিপির কথা জানা যায়। গেইট প্রণীত আসামের ইতিহাস গ্রন্থেও উক্ত তাম্রলিপির উল্লেখ আছে। ইহাদের একটি পাঠে জানা যায় যে, আদি ধর্ম-ফা রাজ্যমধ্যে অনাবৃষ্টি নিবারণকল্পে এক শাস্ত্রীয় যজ্ঞানুষ্ঠানের আয়োজন করেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি মিথিলার রাজা বলভদ্র সিংহের নিকট বৈদিক ব্রাহ্মণ প্রার্থনা করিয়া দূত প্রেরণ করেন। পাঁচজন মৈথিলী ব্রাহ্মণ ৬৪১ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীহট্ট জেলার অন্তর্গত ভানুগাছের নিকট মঙ্গলাপুর গ্রামে যজ্ঞ সম্পন্ন করেন। এই ব্রাহ্মণগণ রাজার অনুরোধে ত্রিপুরা রাজ্যে স্থায়িভাবে বসবাস করিতে সম্মত হন। ত্রিপুরাধিপতি উপরোক্ত তাম্রশাসন দ্বারা তাঁহাদিগকে কতক জমি দান করেন। দুঃখের বিষয়, এই তাম্রলিপির একটিও ইদানীং কালে পাওয়া যায় না। আদি ধর্ম-ফা স্বীয় কন্যা অরুন্ধতীকে শ্রীহট্টের রাজা শ্রীহস্তের সঙ্গে বিবাহ দিয়াছিলেন।

কিরীটের পর যে রাজার রাজত্বকাল মোটামুটি ভাবে নির্ণয় করা যায় তিনি কীর্তিধর বা সিংহতুঙ্গ-ফা। কীর্তিধর আনুমানিক ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রাজ্য লাভ করেন। ততদিনে ভারতবর্ষে হিন্দু-যুগ শেষ হইয়া মুসলমান শক্তির গৌরব-সূর্য প্রায় মধ্যাকাশে পৌঁছাইয়া গিয়াছে।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্যন্ত বাঙলার ইতিহাসে সেন রাজাদের সময় উল্লেখ থাকিলেও দ্বাদশ শতকের আয়ু শেষ হইতে না হইতেই বাঙলার হিন্দু রাষ্ট্রশক্তি নির্বীর্য হইয়া পড়িয়াছিল। ১২০৩ খ্রীষ্টাব্দে বখ্‌তিয়ার খিলজি বাঙলা ও বিহারের অধিপতি হইয়া বসিলেন। মুসলমান শক্তির সঙ্গে ত্রিপুরার প্রথম সংঘর্ষ বাধে অবশ্য আরও পরে—ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে—রাজা ভাঙ্গর–ফার রাজত্বের শেষ পর্বে।

ইতিহাসের এই পালা-বদল কালে ত্রিপুরার রাজকাহিনীতে এক বীর নারীর সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। তিনি কীর্তিধরের পত্নী রাণী ত্রিপুরাসুন্দরী। কীর্তিধর গৌড়েশ্বরের অধীনস্থ কমলাঙ্কের সামন্ত রাজা হীরাবন্ত খাঁর রাজ্য বলপূর্বক অধিকার করিলে হীরাবন্ত খাঁ বাঙলার অধিপতি কেশব সেনের শরণাগত হন। ক্রুদ্ধ কেশব সেন ত্রিপুরার বিরুদ্ধে এক বিপুল সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেন। এই আক্রমণের সংবাদ পাইয়া রাজা কীর্তিধর আত্মসমর্পণের জন্য প্রস্তুত হইলেন। স্বামীর এই দুর্বলতায় মর্মাহত রাণী প্রজাবৃন্দের উদ্দেশ্যে আহ্বান জানাইলেনঃ "তোমাদের রাজা রাজ্যরক্ষায় অসমর্থ। জন্মভূমির সম্মান ও স্বাধীনতা যদি তোমাদের নিকট মূল্যবান হয় তবে আমাকে অনুসরণ কর।"

তিনি স্বয়ং যুদ্ধ-পরিচালনার ভার গ্রহণপূর্বক সৈন্যদলকে উৎসাহিত করিয়া তুলিলেন। প্রচণ্ড রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে ত্রিপুরবাহিনী জয়ী হইল। গড়মণ্ডলের রাণী দুর্গাবতী এবং ঝান্‌সীর রাণী লক্ষ্মীবাই-এর সঙ্গে রাণী ত্রিপুরাসুন্দরীর নামও ইতিহাসে স্মরণীয় সন্দেহ নাই।

# তৃতীয় অধ্যায়

## ইতিহাসের কাহিনীঃ মধ্য ও শেষ পর্ব

ডাঙ্গর-ফার জীবদ্দশায় তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র রত্ন-ফা গৌড়ের মুসলমান শাসনকর্তার সাহায্যে ১২৭৯ খ্রীষ্টাব্দে ত্রিপুরা আক্রমণ করিয়া রাজা হন। ত্রিপুবার ইতিহাসে এই ঘটনা অভিনব। ভ্রাতৃ-বিরোধের সুযোগে যে আক্রমণের সূচনা হয়, ত্রিপুরার পক্ষে উহার প্রভাব সুদূরপ্রসারী হইয়াছিল। পরবর্তী কালে মুসলমান আক্রমণের ঢেউ নদী ও পাহাড়ের প্রাচীর অতিক্রম করিয়া বারবার ত্রিপুরার উপর ভাঙিয়া পড়িয়াছে। ইহার ফলে একদিকে যেমন রাজ্যের সামরিক গৌরব ক্রমশঃ ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে, তেমনি অন্যদিকে সামাজিক ও শাসনক্ষেত্রে পরিবর্তন আসিয়াছে।

রত্ন-ফা যাঁহার সাহায্যে পিতা ও ভ্রাতৃবৃন্দকে বিতাড়িত করিয়া রাজা হইয়াছিলেন, তিনি লখ্‌নাবতীর সুপ্রসিদ্ধ সুলতান তুঘ্রল খাঁ। বত্ন-ফার সময় হইতে ত্রিপুরার রাজগণ "মাণিক্য" উপাধি ব্যবহার করিয়া আসিয়াছিলেন। এই উপাধি মুসলমানদের দেওয়া। রত্ন-ফা রত্নমাণিক্য নামে ইতিহাসে পরিচিত।

তুঘ্রল খাঁর সঙ্গে রত্নমাণিক্যের বন্ধুত্ব নানা দিক হইতে ত্রিপুরার পক্ষে মঙ্গলজনক হইয়াছিল। উত্তরকালে দুই দেশের মধ্যে যে কৃষ্টিগত সম্পর্ক গড়িয়া উঠে, রত্নমাণিক্যের রাজত্বকালে ইহার সূত্রপাত হয়। তৎকালীন ত্রিপুরার সামাজিক অচলায়তনের মধ্যে প্রাণ-সঞ্চারের উদ্দেশ্যে তিনি বিভিন্ন বৃত্তি-ভুক্ত দশ সহস্র বাঙালী প্রজা রাজ্যমধ্যে স্থাপন করিয়াছিলেন। ইহা ছাড়া, রত্নমাণিক্য লখ্‌নাবতী হইতে একজন বিখ্যাত চিকিৎসক ও শাসনকার্যে অভিজ্ঞ

দুইজন বাঙালী হিন্দুকে আমন্ত্রণ করিয়া নিয়া আসিয়াছিলেন। শেষোক্ত ব্যক্তিদ্বয় মুসলমানদের অনুকরণে ত্রিপুরায় নূতন শাসন-প্রণালী প্রবর্তন করেন। রত্নমাণিক্য রাজ্যমধ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য গৌড়ের রাজার নিকট হইতে ৪,০০০ সৈন্য সাহায্য পাইয়াছিলেন।

রত্নমাণিক্যের পর ত্রিপুরার উল্লেখযোগ্য রাজা ধর্মমাণিক্য। তিনি খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ( ১৪০৭ খ্রীঃ অব্দে) রাজ্য-লাভ করেন। ধর্মমাণিক্যের সাহিত্যানুরাগ প্রবল ছিল। তাঁহার রাজত্বকালে ত্রিপুরার রাজবংশের ইতিবৃত্ত রাজমালার রচনা আরম্ভ হয়। তিনি বাঙলা ভাষাকে সর্বপ্রথম রাষ্ট্রভাষা হিসাবে স্বীকৃতিদান করেন।

ধর্মমাণিক্যের পর তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র প্রতাপমাণিক্য মাত্র এক বৎসর রাজত্ব করেন। তিনি সেনাপতিগণ কর্তৃক নিহত হন। তাঁহার স্থলে তদীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ধন্যমাণিক্য রাজ্যলাভ করেন।

ধন্যমাণিক্যের রাজত্বকাল ত্রিপুরার ইতিহাসে এক গৌরবময় অধ্যায়। তিনি ক্রমাগত যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত থাকিয়া ত্রিপুরা রাজ্যের সীমা বর্ধিত করেন। এই সকল যুদ্ধের মধ্যে গৌড়ের পরাক্রান্ত অধিপতি হোসেন শাহের বিরুদ্ধে সংগ্রাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রকৃত পক্ষে ধন্যমাণিক্য রাজা হইয়াই বঙ্গদেশ-বিজয়ে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন। ইহার প্রস্তুতি হিসাবে তিনি বাঙলার অধীনস্থ অনেকগুলি সামন্তরাজ্য ত্রিপুরার অধিকারভুক্ত করেন। ১৫১৩ খ্রীষ্টাব্দে ত্রিপুরগণ গৌড়-সৈন্যকে চট্টগ্রাম হইতে বিতাড়িত করে। এই অপমানে হোসেন শাহ স্বভাবতঃই ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন। ত্রিপুরা

জয়ের উদ্দেশ্যে তিনি দুইবার সৈন্য প্রেরণ করেন; কিন্তু দুইবারই সেনাপতি রিয়াং-জাতীয় রামচাগ ও রায় কছমের নেতৃত্বে ত্রিপুর-বাহিনী মুসলমানদের পর্যুদস্ত করে।

হোসেন শাহের বিরুদ্ধে ত্রিপুর সেনাপতি এক সুচতুর রণ-কৌশল গ্রহণ করিয়াছিলেন। গোমতী নদীর তীরে অপেক্ষমাণ মুসলমান সৈন্যদলকে বিপদে ফেলিবার উদ্দেশ্যে ত্রিপুরগণ নদীর উজানে বাঁধ নির্মাণ করিয়া জলস্রোতকে সাময়িক ভাবে আবদ্ধ রাখিয়াছিল। হোসেন শাহের সেনাপতি এই চাতুরি বুঝিতে না পারিয়া নদী অতিক্রম করিবার জন্য স্বীয় সৈন্যদলকে আদেশ দিলেন। ত্রিপুরগণ এই সুযোগে নদীর বাঁধ কাটিয়া ফেলিল। দেখিতে দেখিতে বাঁধমুক্ত জলরাশি প্রচণ্ডবেগে নিচে নামিয়া আসিয়া মুসলমানদের ভাসাইয়া লইয়া গেল। পরাজিত গৌড়-বাহিনী প্রভূত ক্ষতি স্বীকার করিয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হয়। দ্বিতীয়বারের যুদ্ধে ত্রিপুবগণ হোসেন শাহেব একটি কামান হস্তগত করে। এই কামান আগরতলা সহরের কেন্দ্রস্থলে বর্তমানে রক্ষিত আছে।

হোসেন শাহ তৃতীয়বার ত্রিপুবা আক্রমণ করিয়া পূর্ব-পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণ করিয়াছিলেন। রাজমালার রচয়িতা এই সম্পর্কে নীরব থাকিলেও কবি শ্রীকর নন্দীর লেখায় ইহার উল্লেখ আছে।

ধন্য মাণিক্যের পর উল্লেখযোগ্য রাজা **বিজয় মাণিক্য**। তিনি উত্তর দিকে শ্রীহট্ট ও জন্তীয়া রাজ্যের কিয়দংশ জয় করিয়াছিলেন। তাঁহার শাসনকালে গৌড়েশ্বর উড়িষ্যা-বিজয়ী সুলতান সুলেমান ত্রিপুরাজয়ের উদ্দেশ্যে এক বিপুল বাহিনী প্রেরণ করেন। সম্মুখ-যুদ্ধে ত্রিপুর-সৈন্য পরাজিত হয়। কিন্তু বিজয়ী সৈন্যগণ যখন

পানোৎসবে মত্ত তখন রাত্রির অন্ধকারে আত্মগোপন করিয়া ত্রিপুরগণ অকস্মাৎ আক্রমণপূর্বক শত্রু-শিবিরে ত্রাসের সঞ্চার করিল। মুসলমানদের অধিকাংশ নিহত হইল। পাঠান সেনাপতি বন্দী হইয়া পিঞ্জরাবদ্ধ অবস্থায় রাজধানীতে নীত হইলেন।

মুসলমানদের পুনঃ পুনঃ আক্রমণে ক্রুদ্ধ হইয়া বিজয় মাণিক্য বঙ্গদেশ আক্রমণের আয়োজন করিলেন। ঐতিহাসিক লঙের বিবরণ হইতে জানা যায়, বিজয় মাণিক্য ছাব্বিশ হাজার পদাতিক, বহু-সংখ্যক অশ্বারোহী এবং পাঁচ হাজার নৌকার এক বিরাট বাহিনী লইয়া বাঙলা দেশের বিরুদ্ধে অভিযান করিয়াছিলেন। 'আবুল ফজল-কৃত **আইন-ই-আকবর** গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, বিজয় মাণিক্যের সৈন্যদলে মোট দুইলক্ষ পদাতিক ও এক হাজার হাতী ছিল। সেই সময় মোগলদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পাঠান শক্তি বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিল। বিজয় মাণিক্য এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়াছিলেন। তিনি প্রথমেই সুবর্ণগ্রাম জয় ও লুণ্ঠন করেন। পদ্মা নদী পর্যন্ত তাঁহার অগ্রসর হওয়ার উল্লেখ ইতিহাসে পাওয়া যায়।

বিজয় মাণিক্যের মৃত্যুর পর রাজ্যের সীমা মোটামুটি অক্ষুণ্ণ থাকিলেও ত্রিপুরার রাজাদের গৌরব-রবি ধীরে ধীরে অস্তমিত হইতে থাকে। একদিকে ক্রমাগত বহিঃশত্রুর আক্রমণ এবং অন্যদিকে আভ্যন্তরীণ কলহের পরিণামে রাজশক্তি বহুলাংশে ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। যে সময়ের কথা বলা হইতেছে, সেই সময়ের মধ্যে ভারতবর্ষের ইতিহাসে আর একবার পট-পরিবর্তন হইয়া গিয়াছিল। নির্বীর্য পাঠান-শক্তি দুর্ধর্ষ মোগলদের সঙ্গে ক্ষমতাদ্বন্দ্বে প্রায় নিঃশেষিত হইয়া আসিতেছিল।

বিজয় মাণিক্যের রাজত্বকাল শেষ হইবার পর ১৫৮৫ খ্রীষ্টাব্দে রাল্‌ফ্ ফিচ্ নামক এক ইংরেজ পরিব্রাজক সপ্তগ্রাম হইতে ত্রিপুরার মধ্য দিয়া আরাকান গমন করেন। স্বদেশে জনৈক বন্ধুর নিকট লিখিত পত্রে তিনি মগ ও মোগলদের দ্বারা বারবার ত্রিপুরা আক্রমণ এবং চট্টগ্রাম অধিকারের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার প্রায় অর্ধ শতাব্দী পর, সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে করমণ্ডল উপকূলের ওলন্দাজ গবর্নর ফান্ ডেন ব্রোকের উক্তি হইতে জানা যায় যে, সেই সময় ত্রিপুরার ভাগ্য চক্রাকারে আবর্তিত হইতেছিল। ত্রিপুবগণ কখনও মোগলের পদানত হইয়াছে, আবার কোন সময় আরাকানের রাজার প্রভুত্ব তাহাদের উপর চাপিয়া বসিয়াছে।

ইহা সত্ত্বেও ত্রিপুরা স্বীয় সার্বভৌমত্ব একেবারে হারাইয়া ফেলে নাই। ত্রিপুবার ইতিহাস-প্রণেতা পাশ্চাত্ত্য ঐতিহাসিক সেণ্ডিস লিখিয়াছেন যে, খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত ত্রিপুরা রাজ্য উত্তর দিকে কামরূপ হইতে দক্ষিণে আরাকান পর্যন্ত, পূর্বদিকে ব্রহ্ম-সাম্রাজ্য হইতে পশ্চিমদিকে সুন্দর বন পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। পরাক্রমশালী মোগল সম্রাট্ আকবরের সময়ও যে এই রাজ্য মোগল বশ্যতা স্বীকার করে নাই, ১৬৫২ খ্রীষ্টাব্দে পিটার হেলিন নামক জনৈক লেখকের লেখায় ইহার প্রমাণ রহিয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন: "পাহাড়ের প্রাচীর-বেষ্টিত ত্রিপুরা রাজ্য ক্রমাগত যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থাকা সত্ত্বেও এখন পর্যন্ত মোগলদের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে সক্ষম রহিয়াছে।"

এই সকল প্রমাণসত্ত্বেও বিজয় মাণিক্যের পরবর্তী রাজারা যে আত্মকলহে রাজ্যের শক্তি দুর্বল করিয় ফেলিয়াছিলেন ইহাতে সন্দেহ

নাই। এই হিসাবে বিজয় মাণিক্য ত্রিপুরা-সিংহাসনের শেষ রাজা যিনি স্বীয় বাহুবলে একদিকে মুসলমান এবং অন্যদিকে আরাকানের প্রচণ্ড মগ শক্তিকে প্রতিহত এবং কিয়ৎপরিমাণে খর্ব করিতে পারিয়াছিলেন।

বিজয় মাণিক্যের কনিষ্ঠ পুত্র **অনন্ত মাণিক্য** স্বীয় শ্বশুর ও প্রধান সেনাপতির সাহায্যে রাজ্যলাভ করেন। কিন্তু তাঁহার রাজত্ব দেড় বৎসরের অধিক স্থায়ী হয় নাই। অনন্ত মাণিক্যকে হত্যা করিয়া প্রধান সেনাপতি **উদয় মাণিক্য** নাম ধারণ পূর্বক সিংহাসন অধিকার করেন। সুলেমানের পুত্র দায়ুদের রাজত্বকালে পাঠানসৈন্য চট্টগ্রাম আক্রমণ করিলে উদয় মাণিক্য তাঁহাদের বাধা দেন। এই যুদ্ধে চল্লিশ হাজার প্রাণ হারাইয়া ত্রিপুর সৈন্য সম্পূর্ণভাবে বিধ্বস্ত হয়। কিন্তু মুসলমানদের পক্ষে হতাহতের সংখ্যা ছিল মাত্র পাঁচ হাজার।

"রাজমালা" তৃতীয় লহরের প্রথম রাজা **অমর মাণিক্যের** সময় ত্রিপুরার হৃত গৌরবরশ্মি আর একবারের জন্য উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল। দুর্ভাগ্যের কথা, এই গৌরব দীর্ঘদিন স্থায়ী হয় নাই। অমর মাণিক্যের রাজত্বকালে মুসলমানগণ ত্রিপুরা আক্রমণের আয়োজন করিয়াছিল। কিন্তু সরাইলের সামন্ত রাজা ঈশা খাঁর নেতৃত্বে বারহাজার ত্রিপুর সৈন্যের রণসজ্জার সংবাদ পাইয়া আক্রমণকারীরা অগ্রসর হইতে সাহসী হয় নাই। ইহা ১৫৮৭ খ্রীষ্টাব্দের কথা।

অতঃপর অমরমাণিক্য আরাকানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া ছয়টি থানা অধিকার করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মগদের হস্তে

পরাজিত হইয়া ত্রিপুরসৈন্য চট্টগ্রামে পলাইয়া আসিতে বাধ্য হয়। গরা চট্টগ্রাম পর্যন্ত ত্রিপুরদের অনুসরণ করিলেও তাহাদের াক্ষে সেই যাত্রা আর অগ্রসর হওয়া সম্ভব হয় নাই। অমর মাণক্য ীয় শক্তি পুনরুদ্ধার করিয়া আরাকান-রাজাকে আবার যুদ্ধে আহ্বান জানাইলেন। চতুর আরাকান-অধিপতি ইহার উত্তরে এক বৎসর সময় প্রার্থনা করিয়া দূত প্রেরণ করেন। সন্ধি অনুসারে ত্রিপুর াহিনী যখন নিশ্চিন্তে বিশ্রাম করিতেছিল তখন মগরা অতর্কিতে আক্রমণ করিয়া বসিল। চট্টগ্রামে আরাকান-রাজার হস্তগত হইল। হার পর দুই পক্ষের দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধে বিজয়-মাল্য বারবার হাত-দল হইয়া শেষ পর্যন্ত মগদের করতলগত হয়। বিজয়ী বাহিনী দয়পুরে প্রবেশ করিয়া ধনসম্পত্তি লুণ্ঠন করিল। অমর মাণিক্য াজধানী পরিত্যাগ পূর্বক পলায়ন করিলেন, তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ত্রপুরার যশঃ-সূর্য চিরকালের জন্য অস্তাচলগামী হইল।

ত্রিপুরার বিরুদ্ধে মগরা পর্তুগীজদের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিল। াঙলা দেশে ১৫৬৬ খ্রীষ্টাব্দে পর্তুগীজদের প্রথম আগমন ঘটে। হারা সন্দ্বীপে উপনিবেশ স্থাপন করিয়া অবাধে লুণ্ঠন চালাইতে াকে। এই উদ্দেশ্যে পর্তুগীজদের অনেক আরাকান-রাজার াহ্বানে তাঁহার সৈন্য-বিভাগে যোগ দিয়াছিল। এই দৃষ্টান্ত অনুসরণ রিয়া অমর মাণিক্য পর্তুগীজদের দ্বারা এক নূতন সৈন্যদল গঠন রেন। ইহারা প্রধানতঃ গোলন্দাজের কাজ করিত। এই র্তুগীজদের বংশধরগণ বর্তমানে আগরতলার অদূরে মরিয়াম গরে বসবাস করিতেছে।

অমর মাণিক্যের পরবর্তী রাজা **রাজধর মাণিক্য** অতি শান্তিপ্রিয়

ছিলেন। তাঁহার সময় গৌড়ের অধিপতি ত্রিপুরা লুণ্ঠনের উদ্দেশ্যে একবার সৈন্য প্রেরণ করিয়া ব্যর্থ হন।

রাজধর মাণিক্যের পর **যশোধর মাণিক্য** খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর সূচনায় রাজা হন। তাঁহার সময় দিল্লীর সম্রাট্ জাহাঙ্গীর, ঢাকার নবাব ইসলাম খাঁর প্রতি ত্রিপুরা জয়ের আদেশ প্রদান করেন। যুদ্ধে ত্রিপুরার সৈন্য-বাহিনী পরাজিত হয়। যশোধর মাণিক্য গোপনে অরণ্যমধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেন কিন্তু অল্পকাল মধ্যে মোগলদের হাতে বন্দী হইলেন। সম্রাট্ জাহাঙ্গীর ত্রিপুরার সমুদয় হস্তী তাঁহাকে প্রদানপূর্বক মুক্তি লাভ করার প্রস্তাব করেন। রাজা যশোধর ইহাতে রাজী না হইয়া সন্ন্যাসব্রত গ্রহণের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। অতঃপর তাঁহাকে মুক্তি দেওয়া হয়। মুক্তির পর তিনি আর রাজ্যে প্রত্যাবর্তন করেন নাই।

মোগল সৈন্য প্রায় আড়াই বৎসর কাল রাজধানী উদয়পুর প্রত্যক্ষ অধিকারে রাখিয়া রাজ্যমধ্যে ব্যাপক লুণ্ঠন চালাইল। ত্রিপুরার সমাজপ্রধানগণ আত্মগোপন করিয়া রক্ষা পাইলেন। হিন্দুদের দেব-দেবী অপবিত্র করা হইল। প্রজাসাধারণের দুঃখের সীমা রহিল না। এই সম্পর্কে তৎকালে লোকের মুখে মুখে রচিত গ্রাম্য গান অনেক দিন পর্যন্ত উদয়পুরের গ্রামাঞ্চলে শোনা যাইত। এই সকল গানের একটি নমুনা দেওয়া হইল :

"রাজা কৈ গেলারে—
তোমার সোনার উদয়পুর কারে দিলারে!
কতদূর গিয়া রাজা
ফিরা্যা ফিরা্যা চায়—

( আমার ) সোনায় মোড়ান পাল্কী
মোগলে দৌড়ায়—
দুঃখ রহিল রে ॥
পানিত কান্দে পানিকাউরী
শুকনায় কান্দে উদ,
উদয়পুরের গোয়ালা কান্দে
কারে দিবাম দুধ—
দুঃখ রহিল রে ॥' ইত্যাদি

এক নিদারুণ মহামারীর ফলে মোগলসৈন্য উদয়পুর পরিত্যাগ করিয়া যাইতে বাধ্য হয়। তাহাদের অনেকেই প্রাণ হারায়। সেই সময় হইতে রাজ্যের নিম্ন-ভূভাগ মুসলমানদের কুক্ষিগত হয়।

মুসলমান আধিপত্যকালে উদয়পুরে আউলিয়া ও দরবেশ-সম্প্রদায়ের আগমন ঘটে। বিখ্যাত আউলিয়া বদর সাহেব সম্ভবতঃ এই সময়ই ত্রিপুরায় আসেন। উদয়পুরের নিকট 'বদর মোকাম' আজও তাঁহার স্মৃতি বহন করিতেছে।

যশোধর মাণিক্যের উত্তরাধিকারী **কল্যাণ মাণিক্যের** শাসন-কালে সম্রাট শাজাহানের আদেশে মোগলসৈন্য পুনরায় ত্রিপুরা আক্রমণ করে। এই যুদ্ধে মুসলমানগণ পরাজিত হয়।

কল্যাণ মাণিক্যের পর **গোবিন্দ মাণিক্য** সিংহাসনারোহণ করেন। তাঁহারই কাহিনী অবলম্বনে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের "রাজর্ষি" ও "বিসর্জন" রচিত হইয়াছে।

গোবিন্দ মাণিক্য ১৬৫৯ খ্রীষ্টাব্দে রাজ্য লাভ করেন। বৈমাত্রেয়-ভ্রাতা **নক্ষত্র রায়** মুর্শিদাবাদের নবাবের সাহায্যে সিংহাসন-

অধিকারের চক্রান্ত করিলে তিনি রাজ্য ত্যাগ করিয়া আরাকানে আশ্রয়গ্রহণ করেন। নক্ষত্র রায় ছত্র মাণিক্য নামে রাজা হইলেন। অল্প কয়েক বৎসর রাজত্ব ভোগ করার পর ছত্র মাণিক্যের মৃত্যু হইলে গোবিন্দ মাণিক্য ফিরিয়া আসিয়া পুনরায় রাজ্যভার গ্রহণ করেন।

গোবিন্দ মাণিক্যের আরাকানে অবস্থানকালে শাজাহানের পুত্র সুজা আওরঙ্গজেব-কর্তৃক বিতাড়িত হইয়া মগরাজার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইতিপূর্বে তিনি কিছুকাল ত্রিপুরার রাজার আশ্রয়ে ছিলেন। ত্রিপুরাধিপতির নিকট লিখিত এক পত্রে আওরঙ্গজেব স্বীয় শত্রুকে তাঁহার হস্তে অর্পণ করার দাবি জানাইলে সুজা আরাকানে পলায়ন করেন। আরাকানে গোবিন্দ মাণিক্যের সঙ্গে সুজার খুব বন্ধুত্ব হয় এবং এই বন্ধুত্বের স্মারক হিসাবে তিনি প্রাক্তন ত্রিপুরাধিপতিকে একখানি "নিমচা" তরবারি প্রদান করেন।

ত্রিপুরার রাজবংশের পরবর্তী ইতিহাস গৌরবজনক নয়। গোবিন্দ মাণিক্যের পর হইতে ইংরেজ আমল পর্যন্ত এই ইতিহাসের প্রতিটি পৃষ্ঠায় ক্লীবতা, আত্মকলহ এবং অধঃপতনের ক্লান্তিকর পুনরাবৃত্তি লক্ষ্য করা যায়। অবশ্য ঘনায়মান মেঘপুঞ্জের চারিপাশে যে সামান্য রূপালি-রেখা মাঝে মাঝে চোখে পড়ে না, তাহা নহে। কিন্তু রাজ্যের স্বাতন্ত্র্য বজায় থাকিলেও শাসকশ্রেণীর আত্মমর্যাদা অনেকাংশে মুসলমানদের নিকট বিকাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। অবশ্য পরাক্রান্ত মুসলমান শক্তিকে প্রতিহত করা এই ক্ষুদ্র রাজ্যের পক্ষে কতটুকু সম্ভব ছিল তাহাও বিচার্য। তথাপি এই দুর্বিপাকের সম্মুখে ত্রিপুরার তৎকালীন রাজন্যবর্গ রাজোচিত দৃঢ়তার সঙ্গে দাঁড়াইতে পারেন নাই, ইহা নিঃসন্দেহ।

বাঙলার কুশলী শাসনকর্তা সায়েস্তা খাঁ গোবিন্দ মাণিক্যের পরবর্তী তৃতীয় রাজা দ্বিতীয় **রত্ন মাণিক্যকে** বন্দী করিয়া দিল্লী প্রেরণ করিলে **নরেন্দ্র মাণিক্য** মুসলমানদের সহায়তায় রাজ্য-লাভ করেন। কিন্তু তিনি বেশী দিন সিংহাসনে থাকিতে পারেন নাই। মুসলমানগণ পুনরায় তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া পূর্ববর্তী রাজাকে রাজপদে বসাইলেন। তাঁহারও রাজত্বকাল বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই। তদীয় ভ্রাতা মুর্শিদাবাদের নবাবের সাহায্যে সিংহাসন অধিকার করিয়া লইলেন।

ইহার পর দ্বিতীয় **ধর্ম মাণিক্যের** রাজত্বকাল। মুর্শিদাবাদের নবাব রাজ্যের সমতল অঞ্চলের বিস্তৃত অংশ অধিকার করিয়া মুসলমান জমিদারদের মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়ায় ধর্ম মাণিক্য ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন। তদুপরি উদয়পুরস্থ মোগলসৈন্যদের আচরণ ক্রমশঃ অসহনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। ধর্ম মাণিক্য মোগলদের বিনাশ-সাধনে বদ্ধপরিকর হইলেন। এই উদ্দেশ্যে নৈশ ভোজনের জন্য মুসলমানদের দুর্গমধ্যে আমন্ত্রণ করিয়া পিঞ্জরাবদ্ধ পশুর মত ইহাদের হত্যার আদেশ দিলেন। অতর্কিত আক্রমণে দিশাহারা মোগলদের সামান্য কয়েকজন পলায়নপূর্বক আত্মরক্ষা করিল, অধিকাংশই প্রাণ হারাইল।

ধর্ম মাণিক্যের সঙ্গে বাঙলার নবাবের এক সন্ধি হয়। এই সন্ধি অনুসারে ত্রিপুরার রাজা বার্ষিক কর দিতে স্বীকৃত হন।

১৭৩৯ খ্রীষ্টাব্দে ছত্র মাণিক্যের পুত্র **জগৎ রায়** ত্রিপুরার সিংহাসনে স্বীয় অধিকার-প্রতিষ্ঠার জন্য ঢাকার নবাবের সাহায্য প্রার্থনা করেন। প্রতিদানে তিনি নিয়মিত করদানে সম্মত হন। প্রথমবার

আত্মরক্ষায় সক্ষম হইলেও দ্বিতীয় আক্রমণের সম্মুখে দাঁড়াইতে না পারিয়া ত্রিপুরাধিপতি পলায়ন করিলেন। মুসলমানদের সাহায্যে জগৎ রায় রাজা হইলেন। এই সুযোগে এক বিরাট মুসলমান বাহিনী ত্রিপুরায় জাঁকিয়া বসিল।

আবার সুরু হইল পাল্টা-চক্রান্ত। মুর্শিদাবাদের ধনী মহাজন জগৎ শেঠের সাহায্যে পূর্বতন রাজা আবার সিংহাসন অধিকার করেন। ইহার পর কয়েক বৎসরের মধ্যে মুর্শিদাবাদের গুপ্ত ষড়যন্ত্র-চক্রের অদৃশ্য ইঙ্গিতে বিভিন্ন রাজা আসিলেন এবং চলিয়া গেলেন। ইঁহাদের মধ্যে **জয় মাণিক্য** এবং **ইন্দ্র মাণিক্যের** নাম উল্লেখযোগ্য। ইন্দ্র মাণিক্য পারস্য ভাষায় বিশেষ দক্ষতা লাভ করিয়াছিলেন।

ত্রিপুরার অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে মুসলমানের হস্তক্ষেপ এত প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল যে, ইন্দ্র মাণিক্যের পর **বিজয় মাণিক্য** রাজ্যের সমগ্র রাজস্ব মুর্শিদাবাদে প্রেরণ করিয়া বিনিময়ে মাসিক মাত্র বার হাজার টাকা বৃত্তিভোগে স্বীকৃতি দিয়া নামে মাত্র রাজা হন। এই শর্ত পূর্ণ না করার অপরাধে তিনি বন্দী অবস্থায় মুর্শিদাবাদে প্রেরিত হইয়াছিলেন। তথায় কারাগারে তাঁহার মৃত্যু হয়।

বিজয় মাণিক্যের পর **সমসের গাজী** নামক এক ব্যক্তি নবাবের অনুগ্রহে ত্রিপুরার সিংহাসন অধিকার করেন। তাঁহার কু-শাসনে রাজ্যমধ্যে বিশৃঙ্খলা ও অসন্তোষ দেখা দেয়। অবশেষে নবাব ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে বন্দী করিয়া লইয়া যান এবং কামানের মুখে তাঁহার দেহ ছিন্নভিন্ন করিয়া দেন। সমসের গাজীর পর **কৃষ্ণ মাণিক্য** রাজা হন।
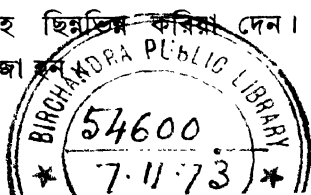
বাঙলা তথা ভারতবর্ষের আকাশে ইতিমধ্যে পুনরায় দুর্যোগ ঘনাইয়া আসিয়াছে। এইবার আর প্রাচীন পথে নয়, নূতন পথে এক সম্পূর্ণ নূতন শক্তি ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করিল। ইহারা ইংরেজ।

রেভারেণ্ড লঙ্ লিখিয়াছেন যে, ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ত্রিপুরার উপর ইংরেজের প্রভুত্ব স্থাপিত হয়। ত্রিপুরার ঐতিহাসিকগণ এই উক্তির যথার্থতা স্বীকার করেন না। বস্তুতঃ ইংরেজ সরকারের সঙ্গে ত্রিপুরার সম্পর্ক কী ছিল সেই বিষয়ে বাদানুবাদের অবকাশ আছে। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি কর্তৃক সংগৃহীত 'Statistical Papers Relating to India' প্রকাশিত হয়। ইহার রচয়িতাগণ ত্রিপুরাকে স্বাধীন রাজ্য বলিয়া বর্ণনা করেন। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'Treaties Engagements and Sunnuds' গ্রন্থে এই কথাই আরও বিশদ ভাবে বলা হয়। এই পুস্তকের মতে ত্রিপুরা ইংরেজ সরকারের সঙ্গে কোনপ্রকার চুক্তিতে আবদ্ধ ছিল না। ("The British Government has no treaty with Tipperah". )

ইংরেজ আমলেও ত্রিপুরা রাজ্য স্বীয় স্বাধীনতা হারায় নাই বলিয়া যাঁহারা দাবি করেন তাঁহারা নিজেদের মতবাদের সমর্থনে উপরি-উক্ত দলিল দুইটি উল্লেখ করিয়া থাকেন। এই সম্পর্কে আরও প্রমাণাদি অবশ্য পাওয়া যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যায় যে, ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে কৃষ্ণকিশোর মাণিক্যের রাজত্বকালে চট্টগ্রামের কমিশনার ভারত সরকারের নিকট এক পত্রে ত্রিপুরাকে বৃটিশ ভারতের অংশ হিসাবে বর্ণনা করিয়া এই রাজ্য-দখলের প্রস্তাব করেন। লর্ড

অকল্যাণ্ড এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়া ত্রিপুরাধিপতিকে পার্বত্য রাজ্যের স্বাধীন রাজা বলিয়া উল্লেখ করেন।

উপরি-উক্ত তথ্যগুলি পাঠ করার পর স্বভাবতঃই প্রশ্ন উঠিবে : লণ্ড সাহেবের পূর্বোল্লিখিত উক্তির মূল্য কি ?

পার্বত্য রাজ্য ছাড়াও চাকলা রোশনাবাদ নামে ত্রিপুরার রাজাদের বিস্তীর্ণ জমিদারীর উল্লেখ ইতিপূর্বে করা হইয়াছে। দেশবিভাগের পর ইহা পূর্ব-পাকিস্থানের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে বাঙলা দেশের দেওয়ানি লাভ করে। সেই সঙ্গে চাকলা রোশনাবাদের উপরও ইংরেজ-প্রভুত্ব স্থাপিত হয়। প্রকৃত পক্ষে বাঙলা দেশের দেওয়ানি-প্রাপ্তির পূর্বেই ত্রিপুরার সমতল অংশ ইংরেজদের অধিকারে চলিয়া গিয়াছিল। গবর্নর ভ্যান্‌সিটার্টের আদেশ অনুসারে চট্টগ্রামের শাসনকর্তা বারলেস্ট ১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দে ত্রিপুরার বিরুদ্ধে এক ক্ষুদ্র সৈন্যদল প্রেরণ করেন। এই সামরিক অভিযানের নায়ক ছিলেক লেফটেনাণ্ট মথি। ত্রিপুরাধিপতি কৃষ্ণ মাণিক্য মথির নিকট আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হন। এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া কৈলাস সিংহ তাঁহার "রাজমালা" গ্রন্থে লিখিয়াছেন : "এইরূপে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির দেওয়ানি-প্রাপ্তির চারি বৎসর পূর্বে ত্রিপুরার সমতল ক্ষেত্র বৃটিশ সিংহের কুক্ষিগত হইয়াছিল। লিক সাহেব ত্রিপুরার প্রথম রেসিডেণ্ট পদে নিযুক্ত হন...রেসিডেণ্ট লিক সাহেবের সময় হইতে চাকলা রোশনাবাদ ও পার্বত্য রাজ্যের বিচারকার্য স্বতন্ত্র ভাবে নির্বাহ হইতে আরম্ভ হয়।"

রাজ্যের সমতল অঞ্চলের উপর, ইংরেজের কর্তৃত্ব-স্থাপনকেই লণ্ড সাহেব ত্রিপুরার উপর ইংরেজ-প্রভুত্ব-প্রতিষ্ঠা বলিয়া বর্ণনা

করিয়াছেন। তাঁহার এই উক্তি একেবারে অযৌক্তিক ছিল না। পরবর্তী ঘটনাবলী লক্ষ্য করিলে ইহার যথার্থতা স্বীকার করিতে হয়।

যে সময়ের কথা বলা হইতেছে, তখন আত্মকলহে ত্রিপুরার রাজশক্তি দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল। এক রাজার মৃত্যুর পর রাজ-সিংহাসনের একাধিক দাবিদার উপস্থিত হইতে লাগিলেন। চাকলা রোশনাবাদ জমিদারীর উত্তরাধিকার-নির্ধারণের জন্য ইংরেজের আদালতে না গিয়া উপায় ছিল না। সেই সঙ্গে সিংহাসনে উত্তরাধি-কারের প্রশ্নও স্বাভাবতঃই আসিয়া পড়িত। এইভাবে ক্রমে ক্রমে কে রাজ্য লাভ করিবেন, তাহা চূড়ান্তভাবে স্থির করার অধিকার ইংরেজ সরকারের হাতে চলিয়া যায়। এই বাস্তব ( De jure ) অধিকার-বলে ইংরেজগণ ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে রামগঙ্গা প্রভৃতির দাবি অগ্রাহ্য করিয়া দুর্গা মাণিক্যকে রাজা বলিয়া স্বীকার করিয়া লয়। দুর্গা মাণিক্যের মৃত্যুর পর রামগঙ্গা মাণিক্য ইংরেজদের সাহায্যেই রাজ্য লাভ করেন।

রামগঙ্গা মাণিক্যের প্রতিদ্বন্দ্বীদের মধ্যে একজনের নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। তিনি রাজভ্রাতা শম্ভুচন্দ্র। সদর দেওয়ানী আদালত রাজসিংহাসনে শম্ভুচন্দ্রের দাবি অগ্রাহ্য করিলে তিনি পার্বত্য চট্টগ্রামে বিদ্রোহের ধ্বজা উড়াইয়া দেন। তাঁহার প্ররোচনায় জুমিয়া প্রজাবৃন্দ রাজ-সরকারের নিকট রাজস্ব-প্রদানে বিরত থাকে। পার্বত্য ত্রিপুরা এবং সমতল অঞ্চলে শম্ভুচন্দ্রের সমুদয় সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হয়। সরকার তাঁহাকে ধরাইয়া দিবার জন্য পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেন। কিন্তু ইহাতে কিছুই ফল হইল না। পার্বত্য প্রজাগণের উপর তাঁহার প্রভাব সত্যই অসামান্য ছিল।

রামগঙ্গা মাণিক্যের জীবদ্দশায় শম্ভুচন্দ্রকে বশে আনা যায় নাই। পরবর্তী রাজা কাশীচন্দ্র মাণিক্য বৃত্তিপ্রদানের ব্যবস্থা করিয়া তাঁহার সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করেন।

সত্য বটে, ত্রিপুরা রাজ্য ইংরেজ সরকারের সঙ্গে কোন চুক্তিতে আবদ্ধ ছিল না। এই কারণে আইনের দৃষ্টিতে ত্রিপুরার সার্বভৌমত্ব ইংরেজদের হাতে কখনও তুলিয়া দেওয়া হয় নাই। কিন্তু ইংরেজগণ ত্রিপুবার স্বাধীনতার মর্যাদা দেয় নাই; এই মর্যাদা আদায় কব্বার মত ক্ষমতাও ত্রিপুরার রাজাদের ছিল না। বিস্ময়েব কথা, দস্যুদের আশ্রয়দানের এক কাল্পনিক অভিযোগে ইংরেজগণ ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে ত্রিপুরার রাজাকে বন্দী করিয়া চট্টগ্রামে লইয়া যায়!

যেহেতু ইংরেজ সরকারের সঙ্গে ত্রিপুরার কোন চুক্তি ছিল না সেই হেতু ত্রিপুবা সরকার কোনপ্রকার করদানে আইনতঃ বাধ্য ছিলেন না। আইনগত বাধ্যবাধকতা না থাকিলেও ইংরেজগণ তুর্গা মাণিক্যের নিকট হইতে নজর আদায় করে। তখন হইতেই নজর-প্রথা চালু হয়। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে কৃষ্ণকিশোর মাণিক্যের রাজ্যাভিষেকের সময় মাত্র ৬৩॥০ মূল্যেব স্বর্ণ ও বৌপ্যমুদ্রা নজর হিসাবে প্রদান করা হয়। পরিমাণের স্বল্পতার জন্য ত্রিপুরার ঐতিহাসিকগণ নজর-প্রথার যথাযোগ্য গুরুত্ব দেন নাই। কিন্তু সিংহাসনের দাবি-প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে ইংরেজের আদালতে উপস্থিত হইয়া ত্রিপুরার রাজন্যবর্গ যেমন নিজেদের সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ণ করিয়াছিলেন, তেমনি নজর-প্রথার মধ্য দিয়া চতুর ইংরেজ ত্রিপুরার উপর প্রকারান্তরে এক নিয়মিত করভার চাপাইয়া দিয়াছিল। কৈলাস সিংহ তাঁহার "রাজমালা" গ্রন্থে ইংরেজ-রচিত "নজরানা রিজলিউশন"

নামে একটি দলিলের উল্লেখ করিয়াছেন। এই দলিল দ্বারা নজর দেওয়ার এক নূতন নীতি চালু করা হয়। নীতিটি এই : কোন রাজার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র রাজ্যলাভ করিলে রাজ্যের এক বৎসরের রাজস্বের অর্ধাংশ এবং পুত্র ব্যতীত অপর কেহ উত্তরাধিকারী নিযুক্ত হইলে এক বৎসরের সমুদয় রাজস্ব নজর হিসাবে দিতে হইবে। শুধু কি ইহাই? উক্ত দলিলের রচয়িতাগণ ত্রিপুরাকে স্বাধীন রাজ্য হিসাবে উল্লেখ করার প্রয়োজন পর্যন্ত বোধ করেন নাই! ইংরেজদের এই ছল-চাতুরির নিদর্শন হিসাবে কৈলাস সিংহ আরও একটি বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন : "ঈশানচন্দ্র মাণিক্যের মৃত্যুর অল্পকাল পরেই 'ট্রিগণমেট্রিকেল সার্ভে' দ্বারা গবর্নমেণ্ট ত্রিপুরা রাজ্য জরিপ আরম্ভ করেন। উক্ত জরিপী কার্য শেষ হওয়ার পর সম্ভবতঃ ১৮৬৫ কিংবা ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দ হইতে গবর্নমেণ্ট 'স্বাধীন ত্রিপুরা' শব্দ বর্জন করতঃ 'পার্বত্য ত্রিপুরা' লিখিতে আরম্ভ করেন।" ইহার উপর মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

১৯০৪ সালের ২১শে জুন তারিখে প্রচারিত সনদে ইংরেজদের "সদিচ্ছা" আরও পরিষ্কারভাবে প্রকাশ পায়। উক্ত সনদের পঞ্চম ধারায় "ভবিষ্যতে রাজ্যের উত্তরাধিকারী-নির্বাচন-ব্যাপারে ভারত সরকারের পূর্বানুমোদন প্রয়োজন হইবে" বলিয়া ঘোষণা করা হয়। তদানীন্তন মহারাজা রাধাকিশোরকে আশ্বাসদান-পূর্বক বলা হয় যে, যতদিন তিনি এবং তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ "বৃটিশ সম্রাটের অনুগত এবং ইংরেজ সরকারের প্রতি বিশ্বস্ত থাকিবেন, ততদিন এই সনদের সকল ধারা সম্পূর্ণভাবে মানিয়া চলা হইবে।"

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসনের অবসান

ঘটে। এই তারিখে ত্রিপুরার নাবালক রাজার পক্ষে রাজ্যবাসীর উদ্দেশে মহারাণী রিজেন্টের স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তি প্রচারিত হয়। এই বিজ্ঞপ্তিতে ত্রিপুরার স্বাধীনতা ও অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ইংরেজদের "বিরক্তিকর হস্তক্ষেপের" কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। বিজ্ঞপ্তিটি এই কারণে ঐতিহাসিকের নিকট গুরুত্বপূর্ণ।

মহারাণী লিখিতেছেন: "আজিকার এই দিনটি রাজ্যের উপর (ইংরেজ) সার্বভৌমত্বের অবসান এবং বিরক্তিকর হস্তক্ষেপ হইতে মুক্তি ও অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ত্রিপুরাবাসীদের মধ্যে পূর্ণ স্বায়ত্ত-শাসনের এক নব-যুগের সূচনা করিতেছে। আমাদের এই প্রাচীন রাজ্যের ঝটিকা-বিক্ষুব্ধ ইতিহাসে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া আমরা নিজেদের স্বাধীনতাকে অমূল্য সম্পদ হিসাবে গণ্য ও ইহার জন্য নিয়ত সংগ্রাম করিয়া আসিয়াছি।"

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি কর্তৃক বাঙলার দেওয়ানি-প্রাপ্তি এবং তৎসহ ত্রিপুরার সমতল অঞ্চলের উপর ইংরেজদের প্রভুত্ব-স্থাপনের পরবর্তী সময়ের উল্লেখ করিয়া লঙ লিখিয়াছেন যে, এই যুগে ত্রিপুরার ইতিহাসে রাজন্যবর্গের সঙ্গে কালেক্টারদের ছোটখাট বিবাদ ছাড়া উল্লেখযোগ্য আর কিছুই ঘটে নাই। এই সকল সংঘর্ষের বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। সামাজিক ক্ষেত্রে দুইটি ঘটনার ঐতিহাসিক মূল্য অবশ্য আছে। ইহাদের একটি সতীদাহ-নিবারণ, অপরটি দাস-বিক্রয়-প্রথার বিলোপসাধন।

ত্রিপুরা রাজ্যে অতি প্রাচীন কাল হইতে সহমরণ প্রথা চালু ছিল। উইলিয়াম বেন্টিঙ্কের আমলে ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে বাঙলা দেশে সতীদাহ আইন দ্বারা রহিত করা হয়। ইহার পরও প্রায় অর্ধ শতাব্দীকাল

ত্রিপুরায় এই নিদারুণ প্রথার অবাধ প্রচলন ছিল। এই সম্পর্কে ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে চট্টগ্রামের ইংরেজ কমিশনার লায়েল-এর আদেশে ত্রিপুরাস্থ পলিটিক্যাল এজেণ্ট এক পত্র দ্বারা সোনামুড়া বিভাগে অনুষ্ঠিত তিনটি সতীদাহের উল্লেখ করিয়া এই বিষয়ে ত্রিপুরা সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। বাঙলা সরকারের পুনঃপুনঃ তাগিদে ঐ বৎসরের শেষ ভাগে **বীরচন্দ্র মাণিক্য** সতীদাহ প্রথার সমর্থন করিয়া এক উত্তর প্রেরণ করেন। ইহাতে ক্ষুব্ধ হইয়া লায়েল স্বয়ং আর একটি চিঠি পাঠান। বলা বাহুল্য, অতঃপর ত্রিপুরার রাজা এক আদেশ দ্বারা সতীদাহ বন্ধ করিতে বাধ্য হন।

সতীদাহের মত এই রাজ্যে দাস-দাসী ক্রয়-বিক্রয় প্রথা বহুকাল ধরিয়া চলিয়া আসিতেছিল। ইংরেজ সরকারের অনুরোধে মহারাজ বীরচন্দ্র এক ঘোষণা দ্বারা এই কুপ্রথা রহিত করিয়া দেন।

তোমরা ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের কথা শুনিয়াছ। এই বিদ্রোহকে ইংরেজ-প্রভুত্বের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষের প্রথম স্বাধীনতা-সংগ্রাম আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। এই সংগ্রামের প্রতি "স্বাধীন" ত্রিপুরার রাজশক্তির মনোভাব কী ছিল তাহা জানিবার কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক। সংক্ষেপে তাহাই বলা হইতেছে।

সিপাহী বিদ্রোহের সময় ত্রিপুরার রাজা ছিলেন **ঈশানচন্দ্র মাণিক্য**। প্রথমেই বলিয়া রাখা দরকার যে, ঈশানচন্দ্রের রাজত্ব-কালে রাজ্যমধ্যে ব্যাপক অশান্তি ও অসন্তোষ বিরাজ করিতেছিল। একদিকে কুকিদের দৌরাত্ম্য এবং অন্যদিকে রাজান্তঃপুরে পারিবারিক কলহ রাজশক্তিকে দুর্বল করিয়া ফেলিয়াছিল। রাজ্যের অমাত্যবর্গ এই কলহের আগুনে ইন্ধন জোগাইয়া অবস্থা আরও গুরুতর করিয়া

তুলিতেছিলেন। এই অবস্থায় প্রবলপরাক্রান্ত ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য অথবা অপ্রকাশ্য প্রতিরোধ সংগঠন করা কিংবা বিদ্রোহী সিপাহীদের সাহায্য করা যে ত্রিপুরার দুর্বল রাজার পক্ষে একেবারে অসম্ভব ছিল তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। অভ্যন্তরীণ গোলযোগের কথা ছাড়িয়া দিলেও বিদ্রোহীদের সক্রিয়ভাবে সাহায্য করার মত সামরিক শক্তি কোথায় ছিল? এক হিসাব হইতে জানা যায় যে, ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে ত্রিপুরার সৈন্যদলে মাত্র আড়াই শত সিপাহী ছিল। ৮৭১ সালের তুলনায় ১৮৫৭ সালে অবস্থা যে ভাল ছিল তাহা মনে করার কোন কারণ নাই। ইংরেজদের বিরুদ্ধে এই সামান্য শক্তি কতটুকু কার্যকরী হইত?

ত্রিপুরার মাটিতে ইংরেজদের সঙ্গে বিদ্রোহী সিপাহীদের কোন সংঘর্ষের উল্লেখ কোথাও পাওয়া যায় না। হাণ্টারের 'Statistical Account of the State of Hill Tipperah'-পাঠে জানা যায় যে, ১৮৫৭ সালের ১৮ই নভেম্বর রাত্রিতে চট্টগ্রামস্থ ৩৪নং পদাতিক বাহিনী বিদ্রোহ ঘোষণাপূর্বক ট্রেজারি লুণ্ঠন করিয়া আগরতলা-অভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকে। এই বিদ্রোহী বাহিনীর সম্মুখীন হওয়ার শক্তি ত্রিপুরার সৈন্যদলের ছিল না। এই হেতু ঈশানচন্দ্র এক ঘোষণা দ্বারা যে সকল বিদ্রোহীদের রাজ্যমধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখা যাইবে তাহাদের বন্দী করিয়া ইংরেজদের হস্তে সমর্পণ করার আদেশ প্রদান করেন।

অপর একজন ইংরেজ লেখক এই সম্পর্কে যাহা বলিয়াছেন, তাহার সারমর্ম এই: ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ ত্রিপুরাকে স্পর্শ করে নাই। এই বৎসর নভেম্বর মাসে এক সংবাদ পাওয়া যায় যে,

চট্টগ্রামের বিদ্রোহীদের কিয়দংশ পার্বত্য ত্রিপুরার মধ্য দিয়া উত্তরাভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। উক্ত সংবাদে রাজ্যমধ্যে সাময়িক ত্রাসের সঞ্চার হয়। বিদ্রোহীদের সঙ্গে কিছুসংখ্যক কয়েদী ও পার্বত্যবাসীও ছিল। তাহারা উদয়পুর অতিক্রম করিয়া যায়। কিন্তু কুমিল্লা যাইবার রাস্তা ধরিয়া অগ্রসর হওয়া অসম্ভব বুঝিয়া বিদ্রোহিগণ পুনরায় অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিয়া উত্তরদিকে অগ্রসর হইতে থাকে।

•সমসাময়িক কালের ঐতিহাসিক কৈলাস সিংহ লিখিয়াছেন: "১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহের সময় চট্টগ্রামের বিদ্রোহী সৈন্যগণ সাহায্যলাভের আশায় ত্রিপুরাধিপতির নিকট আসিতেছে এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া ঈশানচন্দ্র তাহাদিগকে ত্রিপুরা হইতে বাহির করিয়া দিতে আদেশ করেন। তাহারা এই আদেশ-শ্রবণে ত্রিপুরা রাজ্য পরিত্যাগপূর্বক বৃটিশ রাজ্য দিয়া কাছাড়াভিমুখে প্রস্থান করে। কয়েকজন বিদ্রোহী সেই আদেশ অবহেলাপূর্বক আগরতলার নিকটবর্তী স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করে। মহারাজ এই সংবাদ অবগত হইয়া তাহাদিগকে ধৃত করিয়া কুমিল্লাস্থ ইংরেজ কর্তৃপক্ষের হস্তে সমর্পণ করেন। তথায় তাহাদের ফাঁসী হয়।"

এই প্রসঙ্গে কৈলাসবাবু আরও একটি সংবাদ পরিবেশন করিয়াছেন। সংবাদটি এই: "গবর্নমেণ্ট সন্দেহ দ্বারা পরিচালিত হইয়া ত্রিপুরেশ্বরকে বিদ্রোহিগণের সাহায্যকারী বলিয়া ত্রিপুরা রাজ্য দখল ও ত্রিপুরাধিপতিকে কারারুদ্ধ করিবার জন্য অনুমতি প্রচার করেন।" এই সংবাদের সূত্র ধরিয়া ইদানীং কেহ কেহ সিপাহী বিদ্রোহে ত্রিপুরার রাজার ভূমিকা সম্পর্কে হাণ্টার প্রভৃতি লেখকদের প্রদত্ত বিবরণীর যথার্থতা সম্পর্কে প্রশ্ন তুলিয়াছেন। এই বিষয়ে

ভবিষ্যতে আরও দলিল-পত্র আবিষ্কৃত হইলে প্রকৃত অবস্থা সম্যক জানা যাইবে। কিন্তু এখন পর্যন্ত যে সকল প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে তাহা হইতে বিদ্রোহীদের প্রতি ত্রিপুরার রাজার সামান্যতম সমর্থনের কোন নির্দশনও পাওয়া যায় না। বরং লুসাই ও কুকিদের বিরুদ্ধে অভিযান এবং প্রথম ব্রহ্মযুদ্ধের সময় ত্রিপুরাধিপতি ইংরেজদের সাহায্যই করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের অন্যান্য সামন্ত রাজাদের মনোভাব দর্শন করিয়া ত্রিপুরার রাজাকেও সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখা ইংরেজদের পক্ষে অস্বাভাবিক ছিল না। যাহারা ডাকাতদের প্রতি সহানুভূতির সন্দেহে একটি স্বাধীন রাজ্যের অধিপতিকে বন্দী করিতে পারে, তাহারা সিপাহী বিদ্রোহের মত দেশব্যাপী দাবানলের মধ্যে দাঁড়াইয়া সকল দেশীয় রাজাকেই শত্রু জ্ঞান করিবে, ইহাতে আর আশ্চর্য কি ?

ঈশানচন্দ্র বিদ্রোহীদের সহায়তা না করিলেও রাজপরিবারের মধ্যে ইংরেজদের প্রতি বিরূপ মনোভাবাপন্ন ব্যক্তির অভাব বোধ হয় ছিল না। কিন্তু তাঁহারা বিদ্রোহীদের কতখানি সাহায্য করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন সেই সম্পর্কে কোন তথ্য পাওয়া যায় না। শোনা যায়, পার্বত্য সর্দারদের মধ্যে অনেকে সিপাহীদের নানাভাবে সাহায্য করিয়াছিলেন। অবশ্য এই সম্পর্কে কোন লিখিত প্রমাণ নাই। তবে পার্বত্য প্রজাদের মধ্যে যে ইংরেজ-বিরোধী মনোভাব বিদ্যমান ছিল তাহার পরোক্ষ প্রমাণ রহিয়াছে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বিদ্রোহী শম্ভুচন্দ্রের প্রতি তাহাদের সমর্থনের কথা উল্লেখযোগ্য। সিপাহীদের প্রত্যক্ষ সাহায্য না করিলেও ত্রিপুরার অরণ্যবাসিগণ অন্ততঃ তাহাদের বিরোধিতা করে নাই এই কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

# চতুর্থ অধ্যায়

## প্রকৃতির যাদুঘর

ত্রিপুরার বর্তমান আয়তন ৪১১৫ বর্গমাইল। এই হিসাব সূচনায় পাইয়াছি। অতীত ইতিহাস-আলোচনায় এই কথাও জানিয়াছি যে, একদিন এই রাজ্য উত্তর-দক্ষিণে কামরূপ হইতে আরাকান পর্যন্ত এবং পূর্ব-পশ্চিমে ব্রহ্মদেশ হইতে সুন্দরবন পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। বেশী দিনের কথা নহে, ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির এক দলিলে ত্রিপুরার আয়তন ৭,৬৩২ বর্গমাইল বলিয়া উল্লেখ আছে। এখন আর সেই রামও নাই, সেই অযোধ্যাও নাই। দেশ-বিভাগের ফলে চাকলা রোশনাবাদ নামক ত্রিপুরা জেলাস্থ বিরাট জমিদারী পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

চারি হাজার বর্গমাইল বলায় রাজ্যের আয়তনটা হয়ত পরিষ্কার বোঝা গেল না। তোমাদের মধ্যে যাহারা অঙ্কে অপেক্ষাকৃত অপটু, তাহারা স্বভাবতঃই প্রশ্ন করিবেঃ সে আবার কত বড়? একটা তুলনা দিয়া হিসাবটা আর একটু পরিষ্কার করা ভাল।

পশ্চিমবঙ্গের মোট আয়তন কত জান? একত্রিশ হাজার বর্গমাইলের কাছাকাছি। পনেরটি জেলা লইয়া পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য গঠিত। এই জেলাগুলির মধ্যে চব্বিশ-পরগণা বৃহত্তম। ইহার আয়তন ৫,৬৩৯ বর্গ মাইল। অর্থাৎ ত্রিপুরা রাজ্য হইতে পশ্চিমবঙ্গের এই একটি জেলার আয়তনই প্রায় দেড় হাজার বর্গমাইল বেশী। সমস্ত পশ্চিম বাঙলার সঙ্গে তুলনায় ত্রিপুরা প্রায় আট ভাগের এক ভাগ। এইবার তুলনামূলক হিসাব ছাড়িয়া সহজ একটা

অঙ্কের হিসাব জানিয়া রাখ। ত্রিপুরা রাজ্য উত্তর-দক্ষিণ দিকে লম্বায় প্রায় ১১৪ মাইল এবং পূর্ব-পশ্চিম দিকে ৭০ মাইল।

আয়তনে ক্ষুদ্র হইলে কি হইবে, প্রকৃতি এখানে নানারূপ বৈচিত্র্যে সৌন্দর্যময়। উন্নতশীর্ষ পর্বতমালার মধ্যে মধ্যে রহিয়াছে নদী-বিধৌত উর্বর উপত্যকাভূমি। কবি-বর্ণিত "নিশ্চল সবুজ বন্যার" মত বহুদূর-বিস্তৃত শস্য-সমৃদ্ধ উপত্যকাসমূহ ত্রিপুরার প্রকৃতিকে অপরূপ শ্রী দান করিয়াছে। তোমাদের মধ্যে অনেকে নিশ্চয়ই আগরতলা হইতে আসামের সীমান্ত পর্যন্ত নব-নির্মিত পার্বত্য-পথ অতিক্রম করিয়াছে। এই প্রশস্ত রাজপথ যে সকল স্থানে পর্বতশৃঙ্গ স্পর্শ করিয়া গিয়াছে, সেখানে দাঁড়াইয়া নিচের সমতল ভূমির দিকে তাকাইলে হৃদয় বিমুগ্ধ হইবে, মনের নিরুদ্ধ আবেগ তরঙ্গায়িত হইয়া সহস্র ধারায় গলিয়া পড়িবে, অন্তরের সমস্ত সুধা উজাড় করিয়া বলিতে ইচ্ছা করিবে ঃ

> "ও আমার দেশের মাটি
> তোমার পায়ে ঠেকাই মাথা —"

* * * * *

ইংরেজ আমলে এই রাজ্য পার্বত্য ত্রিপুরা বলিয়া খ্যাত ছিল। লোকে বলিত স্বাধীন ত্রিপুরা। বস্তুতঃ ত্রিপুরার পর্বতশ্রেণী ভৌগোলিক দিক হইতে এই ক্ষুদ্র রাজ্যকে বৈশিষ্ট্য প্রদান করিয়াছে। এই ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য অতীতে রাজ্যের আদিম মানুষগুলিকে বহিরাক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার সুযোগ দিয়াছে।

পাঁচটি পর্বতমালা প্রায় সমান্তরালভাবে উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত।

ইহাদের নাম বড়মুড়া, আঠারমুড়া, লংতরাই, সাকান ও জামপুই। বড়মুড়ার এক অংশ দেবতামুড়া নামে পরিচিত। গোমতী নদীর তীরে এই পর্বত-গাত্রে অনেক দেবদেবীর মূর্তি খোদিত রহিয়াছে। এই কারণেই দেবতামুড়া নামের উৎপত্তি হইয়াছে। অনেকগুলি খণ্ড-পর্বত পূর্ব-পশ্চিমে অথবা তির্যগ্‌ভাবে উক্ত পাঁচটি পর্বতকে সংযুক্ত করিয়াছে।

ত্রিপুরার সমগ্র আয়তনের প্রায় শতকরা ৬৩ ভাগ জঙ্গলাকীর্ণ। সহজতর অঙ্কের হিসাবে রাজ্যের মোট ২৬,৩৪,৪২০ একর পরিমাণ জমির মধ্যে ১৬,৬২,২০০ একরই বনভূমি।

**নদী-মেখলা**

পর্বতশ্রেণী উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত থাকার ফলে এই রাজ্যের নদীগুলিও উত্তর-দক্ষিণবাহিনী। ইহাদের নাম : গোমতী, হাওড়া, বুড়ীমা, খোয়াই, মনু, দেও, ধলাই, জুরী, লংগাই, মুহুরী, ফেণী। পর্বতাভ্যন্তর হইতে নির্গত ছোট-বড় অসংখ্য ছড়া এই নদীগুলিকে পুষ্ট করিতেছে। সাধারণতঃ নদীগুলি ক্ষীণকায়। কিন্তু পার্বত্য নদীর ক্ষেত্রে সচরাচর যাহা দেখা যায়, এই ক্ষেত্রেও বর্ষাকালে নদীগুলি ভীষণ আকার ধারণ করে। ইহাদের মধ্যে গোমতী সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ।

রাইমা ও শর্মা নামক দুইটি বড় ছড়া সর্দিং খণ্ড-পর্বত ও আঠারমুড়ার মধ্যবর্তী কমলাখা-হাওরের দক্ষিণ ও উত্তর দিক হইতে আসিয়া ডুছড়িতে মিলিত হইয়াছে। এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলে পূর্ববঙ্গ হইতে আগত আশ্রয়প্রার্থী এবং ভূমিহীন জুমিয়াদের পুনর্বাসনের

এক পরিকল্পনা সম্প্রতি ভারত সরকার গ্রহণ করিয়াছেন। এই হেতু সংবাদপত্র মারফৎ রাইমা-শর্মার নাম ত্রিপুরার বাইরেও প্রচারিত হইয়াছে।

রাইমা ও শর্মা ছড়াদ্বয় আরও কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলধারার সঙ্গে মিলিত হইয়া আঠারমুড়া অতিক্রমপূর্বক তীর্থমুখের নিকট গোমতী নদীর আকার ধারণ করিয়াছে। এই স্থানে সাতটি জলপ্রপাত বা "কিল্লা" সৃষ্টি হইয়াছে। এই সাত-তলা প্রপাতই ডম্বুরু নামে খ্যাত।

ত্রিপুরার সর্বশ্রেণীর আদিবাসী গোমতী নদীর পূজা করিয়া থাকেন। পূতসলিলা গোমতীর উৎস-স্থলও এই কারণে তীর্থস্থান বলিয়া গণ্য হয়। তীর্থমুখের কুণ্ডতে প্রতিবৎসর রিয়াং প্রভৃতি আদিবাসী নরনারী পুণ্যস্নানের উদ্দেশ্যে সমবেত হন।

ব্যাপক জঙ্গল আবাদ ও বৃক্ষসমূহের নির্বিচার ধ্বংস সাধনের ফলে রাজ্যের নদীগুলি ক্রমশঃ বুজিয়া আসিয়াছে। এই হেতু একদিকে কৃষির ক্ষতি এবং অন্যদিকে বন্যার পৌনঃপুনিকতায় জনপদের সর্বনাশ সাধিত হইতেছে।

## ভূমি-বিন্যাস

ত্রিপুরার পর্বতশ্রেণী মূলতঃ নরম মাটির। পর্বতের বহিরাবয়ব-মাত্র বেলে পাথরে গঠিত। পর্বতশ্রেণীর মধ্যবর্তী বিস্তীর্ণ উপত্যকা পলিমাটি দ্বারা গঠিত। উর্বরতায় ইহা পার্শ্ববর্তী পূর্বপাকিস্তানের জেলাগুলির সমতুল্য। ধান, পাট, তিল, কার্পাস, ইক্ষু ও নানা-জাতীয় ফল এই রাজ্যের সমতল অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়।

**অরণ্য-সম্পদ**

ত্রিপুরার পাহাড়-অঞ্চলে সর্বত্র ঘন বাঁশের বন দৃষ্ট হয়। দেশ-বিভাগের পূর্বে বাঁশ ও বন হইতে রাজ্যের প্রভূত আয় হইত। নানা-প্রকার শিল্পকর্মের উপযোগী উৎকৃষ্ট গুণসম্পন্ন বাঁশ অধুনা চাহিদার অভাবে ক্রমশঃ লুপ্ত হইতে চলিয়াছে। ত্রিপুরার বাঁশের বাঁশী সঙ্গীত-রসিক মহলে সুপরিচিত।

এককালে এই রাজ্যের বনভূমিতে শাল, গর্জন, নাগেশ্বর, জারুল, চাম্বল, গাম্ভারী প্রভৃতি বৃক্ষ প্রচুর পাওয়া যাইত। এইগুলি ছাড়া কুচিলা (Nux Vomica) প্রভৃতি নানাপ্রকার বনৌষধি এবং মূল্যবান আগর গাছও একেবারে দুষ্প্রাপ্য ছিল না। কথিত আছে, 'আগর' নাম হইতেই রাজধানী আগরতলা নামের উৎপত্তি হইয়াছে। আগরতলা-আসাম রাস্তার পার্শ্ববর্তী ডলুবাড়ীর নিকট দুই-একটি আগর গাছের সন্ধান আজ পর্যন্তও পাওয়া যায়। আদিবাসীদের মধ্যে জুমচাষের ব্যাপক প্রচলনহেতু অরণ্য-সম্পদ ক্রমশঃ ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া পর্বতশ্রেণীকে নিরাভরণ করিয়া ফেলিয়াছে।

**বন্যজন্তু**

ত্রিপুরার হস্তী ইতিহাস-খ্যাত। মোগল আমলে প্রধানতঃ এই রাজ্যের হস্তী-সম্পদের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া মুসলমানগণ বারংবার ত্রিপুরা আক্রমণ করিয়াছিলেন। সম্রাট আকবরের পিলখানার বর্ণনা-প্রসঙ্গে আবুল ফজল "আইন-ই আকবরী" গ্রন্থে মোগল সৈন্যদলভুক্ত হস্তিযূথের মধ্যে ত্রিপুরার হস্তী সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। দেশ-বিভাগের পূর্ব পর্যন্ত প্রতি বৎসর বহুসংখ্যক

হস্তী ধৃত হইয়া বাহিরে চালান যাইত। ইহা হইতে রাজভাণ্ডারে যে পরিমাণ অর্থাগম হইত তাহা সামান্য ছিল না। এক হিসাব হইতে জানা যায় যে, ১৮৭৪-৭৫ সালে রাজ্যের মোট ১,৮৬,৯৩২ টাকা আয়ের মধ্যে এক "হস্তী খেদা" হইতেই ২৫,০০০ টাকা রাজস্ব হিসাবে আদায় হয়। কৈলাসহরের অন্তর্গত মনু ও দেও নদী-অঞ্চলে এবং উদয়পুর বিভাগে এখন বন্য হস্তী দৃষ্ট হয়।

বন্যজন্তু সংরক্ষণের জন্য ত্রিপুরার প্রাক্তন রাজ-সরকার কোনদিনই কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করেন নাই। ফলে বন্যজন্তু ক্রমশঃ দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে। পূর্বে উদয়পুর বিভাগের পূর্ব সীমার উত্তর ও দক্ষিণ প্রান্তে গণ্ডার পাওয়া যাইত। অম্পি ও ব্রহ্মছড়া অঞ্চলে গেড়াছড়া নামক ছড়া ইহার সাক্ষ্য বহন করিতেছে। অনুমান হয়, গেড়া ( গণ্ডার ) থাকিবার স্থান বলিয়া এই নামের উৎপত্তি হইয়াছে।

বর্তমান কালে অরণ্য-মধ্যে যে সকল বন্যজন্তু পাওয়া যায়, তন্মধ্যে ব্যাঘ্র, হরিণ ও শূকর উল্লেখযোগ্য। ভালুক ও বাইসন-জাতীয় হিংস্র প্রাণী মাঝে মাঝে দৃষ্ট হয় বলিয়া কোন কোন অঞ্চলের আদিবাসীদের মুখে শোনা যায়।

নানাজাতীয় পাখী ত্রিপুরার অরণ্য-ভূমিকে সঙ্গীত-মুখর করিয়া রাখিয়াছে। ইহারা এই রাজ্যের এক বিচিত্র সম্পদ, সন্দেহ নাই। ইহাদের মধ্যে ধনেশ, ময়না, তোতা, ভৃঙ্গরাজ প্রভৃতি পাখীর নাম উল্লেখযোগ্য। কৈলাস সিংহের "রাজমালা" পাঠে জানা যায় যে, টিয়া, ময়না, চন্দনা প্রভৃতি তোতা-জাতীয় পাখী প্রতি বৎসর দশ হইতে পনর হাজার পর্যন্ত ধৃত হইয়া পার্শ্ববর্তী ত্রিপুরা, নোয়াখালী ও শ্রীহট্ট জেলায় বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে প্রেরিত হইত।

## তাপমান ও বৃষ্টিপাত

মোটামুটি ভাবে বলা যায় যে, ত্রিপুরার ঋতু ও আবহাওয়া-গত অবস্থা পার্শ্ববর্তী পূর্বপাকিস্তানের অনুরূপ। রাজ্যের সমস্ত অংশে শীত-গ্রীষ্মের পরিমাণসূচক সঠিক হিসাব পাওয়া যায় না। ১৯৫৫ সালে প্রকাশিত এক সরকারী বিবরণীতে রাজধানী আগরতলার আবহাওয়া সম্পর্কে এক হিসাব দেওয়া হইয়াছে। উক্ত হিসাব হইতে দেখা যায় যে, আগরতলায় জানুয়ারী মাসে শীতের সর্বাধিক প্রকোপ থাকে এবং ইহার পর হইতে শীত কমিয়া আসিয়া এপ্রিল মাসে প্রচণ্ডতম গরম পড়ে। নিচের হিসাবটা লক্ষ্য করিলে এই সম্পর্কে সম্যক ধারণা হইবে :

**তাপমান**

| মাস | গৃহাভ্যন্তরে | | বাহিরে | |
|---|---|---|---|---|
| | সর্বাধিক | সর্বনিম্ন | সর্বাধিক | সর্বনিম্ন |
| জানুয়ারী, ১৯৫৩ | ৭৪ | ৬১ | ৭৮ | ৫২ |
| ফেব্রুয়ারী ” | ৮৩ | ৬১ | ৮৭ | ৫৪ |
| মার্চ ” | ৮৮ | ৭২ | ৯১ | ৬৬ |
| এপ্রিল ” | ৯২ | ৭৮ | ৯৬ | ৭০ |
| মে ” | ৯১ | ৭৫ | ৯৩ | ৭৩ |
| জুন ” | ৯২ | ৭৭ | ৯৩ | ৭৪ |
| ... ... ... ... | ... ... | ... ... | ... ... | ... ... |
| ডিসেম্বর, ১৯৫৩ | ৮০ | ৭১ | ৮১ | ৫৯ |

ত্রিপুরায় গড়পড়তা বৃষ্টিপাতের হার ১০০″। বিভাগ অনুযায়ী ১৯৫৩ সালের বৃষ্টিপাতের পরিমাণ নিচে দেওয়া হইল ঃ

| | |
|---|---|
| আগরতলা | ৯৬.৯৪″ |
| খোয়াই | ৪৬.৯০″ |
| কৈলাসহর | ৮২.০১″ |
| ধর্মনগর | ১২০.৪৫″ |
| কমলপুর | × |
| সোনামুড়া | ১৫২০″ |
| উদয়পুর | ১৮.৩৪″ |
| বিলোনীয়া | ১১৪.৯৭″ |
| সাব্রুম | ১২৫.৬০″ |
| অমরপুর | ৭৮.০৯″ |

রাজ্যের সর্বত্র বৃষ্টিপাতের হার এক নহে। বরং মহকুমাভেদে বৃষ্টিপাতের হারে উল্লেখযোগ্য তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। এই রাজ্যে জুন মাসে সর্বাধিক বৃষ্টি হয়।

# পঞ্চম অধ্যায়

## জন-পরিচিতি

সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে যেমন, ক্ষুদ্র আয়তনের মধ্যে ত্রিপুরার অরণ্য-রাজ্যেও তেমনি বহু বিচিত্র মানুষের মিলন ঘটিয়াছে। এখানে সমতলবাসী বাঙালীর পাশে রহিয়াছে ভিন্ন ভিন্ন কৌম-ভুক্ত সরল-প্রাণ আদিবাসী। সামাজিক আচার-নিয়ম এবং সংস্কৃতি ও ভাষাগত পার্থক্য সত্ত্বেও ইহারা যুগ-পরম্পরায় একে অন্যের সান্নিধ্যে বাস করিয়া আসিতেছে। সময় সময় বিবাদ ঘটিয়াছে, মিলন ঘটিয়াছে আরও বেশী। ত্রিপুরা ইহাদের সকলের আবাসভূমি, ত্রিপুরার জল-মাটি-আকাশ ইহাদের অস্থিমজ্জায় সমভাবে প্রাণসঞ্চার করে। যাহারা নবাগত—দেশ-বিভাগের ফলস্বরূপ বিড়ম্বিত ভাগ্য লইয়া যাহারা একদিন পিতৃপুরুষের ভদ্রাসন পরিত্যাগপূর্বক উন্মুক্ত রাজপথে নামিয়া আসিয়াছিলেন, আজ যাঁহারা এই রাজ্যের মমতাময়ী মৃত্তিকা আশ্রয় করিয়া জীবনের ভাঙা-হাটে পুনরায় সুখ ও সমৃদ্ধির স্বর্ণ-সৌধ নির্মাণকল্পে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন—তাঁহারাও নিজেদের ত্রিপুরাবাসী বলিয়া পরিচয় দিতে গর্ববোধ করেন।

কোন দেশেই জনসংখ্যা বরাবর একরকম থাকে না। এই সহজ কথাটা বুঝিতে তোমাদের নিশ্চয়ই অসুবিধা হইবে না। দেশে নূতন নূতন শিশু জন্ম লইতেছে, আবার বহু লোকের মৃত্যুও ঘটিতেছে। ইহা নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা। শুধু কি তাহাই? জন-

সংখ্যার একটা অংশ জীবিকার অন্বেষণে অথবা অন্য নানাবিধ কারণে স্বদেশের বাহিরে চলিয়া যাইতেছে। তাহাদের কেহ ফিরিয়া আসে, অনেকে ফিরিয়া আসে না। আবার বাহির হইতে বহু লোকের আগমন ঘটিতে পারে। তাহাদের মধ্যেও কেহ কেহ স্বদেশে ফিরিয়া যায়। আবার অনেকে যায় না। এইভাবে ক্রমাগত যোগ-বিয়োগের মধ্য দিয়া একটা নির্দিষ্ট দেশের জনসংখ্যার পরিবর্তন ঘটে।

ত্রিপুরার জনসংখ্যাও উপরোক্ত নিয়মে পরিবর্তিত হইয়াছে। ১৯৫১ সালের সেন্সাস অনুসারে এই রাজ্যের মোট অধিবাসীর সংখ্যা ৬,৩৯,০২৯। অথচ ত্রিশ বৎসর আগে, অর্থাৎ ১৯২১ সালে জনসংখ্যা ছিল সাড়ে তিন লক্ষের কিছু বেশী। নিচের হিসাবটা লক্ষ্য করিলে এই পরিবর্তনের চিত্র পাওয়া যাইবে :

| বৎসর | জনসংখ্যা | মোট বৃদ্ধি | বৎসব | জনসংখ্যা | মোট বৃদ্ধি |
|---|---|---|---|---|---|
| ১৮৭২ | ৩৫,২৬২ | × | ১৯২১ | ৩,০৪,৪৩৭ | ৭৪,৮২৪ |
| ১৮৮১ | ৯৫,৬৩৭ | ৬০,৩৭৫ | ১৯৩১ | ৩,৮২,৪৫০ | ৭৮,০১৩ |
| ১৮৯১ | ১,৩৭,৪৪২ | ৪১,৮০৫ | ১৯৪১ | ৫,১৩,০১০ | ১,৩০,৫৬০ |
| ১৯০১ | ১,৭৩,৩২৫ | ৩৫,৮৮৩ | ১৯৫১ | ৬,৩৯,০২৯ | ১,২৬,০১৯ |
| ১৯১১ | ২,২৯,৭১৩ | ৫৬,২৮৮ | | | |

এই খতিয়ান অবশ্য নির্ভুল নহে। সরকারী সূত্রেই প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় সেন্সাসের ত্রুটি-বিচ্যুতি স্বীকার করা হইয়াছে। চতুর্থ অর্থাৎ ১৯০১ সাল হইতে লোক-গণনার হিসাব নির্ভরযোগ্য বলিয়া ধরা যায়। অনেকের মতে ১৯৫১ সালের হিসাবও ত্রুটিপূর্ণ। ঐ সময় রাজ্যের অভ্যন্তরে রাজনৈতিক গোলযোগের কথা স্মরণ

করিলে উক্ত ধারণা যুক্তিসঙ্গত মনে হইবে। এই সকল ত্রুটি সত্ত্বেও উপরের হিসাব হইতে বিগত প্রায় এক শতাব্দী ধরিয়া ত্রিপুরার অরণ্য-ভূমিতে লোকবৃদ্ধির একটা মোটামুটি আভাষ পাওয়া যায়।

একটু লক্ষ্য করিলেই বুঝা যাইবে, লোক-সংখ্যার উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি ঘটিয়াছে ১৯৩১ হইতে ১৯৫১ সাল পর্যন্ত মোট বিশ বৎসরে। এই সময়কে দুইটি পর্বে ভাগ করিলে দেখা যায়, বৃদ্ধির হার ১৯৪১-৫১ সালের মধ্যবর্তী সময় অপেক্ষা ১৯৩১-৪১ সালে বেশী। ১৯৪১ সালের পর পূর্ব-বঙ্গে সাম্প্রদায়িক গোলযোগ এবং শেষ পর্যন্ত দেশ-বিভাগের পর সহস্র সহস্র উদ্বাস্তু-আগমনের কথা চিন্তা করিলে প্রাক্-চল্লিশ ও উত্তর-চল্লিশ যুগের লোকবৃদ্ধি-হারের এই তারতম্য অস্বাভাবিক মনে হইতে পারে। ইহাকে দুইভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। প্রথমতঃ দেশ-বিভাগের পর একদিকে যেমন উদ্বাস্তু-আগমন ঘটিয়াছে, অন্যদিকে কিছুসংখ্যক মুসলমান এই রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া পাকিস্তানে চলিয়া গিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ ইহা খুবই স্বাভাবিক যে, ১৯৪৯ সালে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে ত্রিপুরার অন্তর্ভুক্তির পর পাহাড়-অঞ্চলে যে অনিশ্চিত অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহার ফলে লোক-গণনার কাজ সঠিকভাবে অগ্রসর হইতে পারে নাই। এই কারণে আদিবাসীদের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ গণনার বাহিরে থাকিয়া যাওয়াও বিচিত্র নহে। ১৯৫১ সালের সেন্সাসে রাজ্যের মোট অধিবাসীর সংখ্যা কম করিয়া ধরা হইয়াছে এই কথা স্বীকার করিয়া লইলেও ১৯৩১-৪১ সালের মধ্যবর্তী সময়ে জনসমষ্টি যে পূর্ববর্তী কালের তুলনায় বিস্ময়করভাবে বৃদ্ধি

পাইয়াছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। সরকারী বিবরণীতে ইহার কোন উল্লেখ না থাকিলেও অনুমান হয়, ত্রিশ দশকের গোড়ায় বিশ্বব্যাপী আর্থিক সংকটের যুগে কৃষি-ভারতের উপর যে সর্বনাশা প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়, তাহারই ফলে পূর্ব-বাঙলার জেলাগুলি হইতে বিরাটসংখ্যক নিঃস্ব কৃষিজীবী অনাবাদী উর্বর জমির অন্বেষণে ত্রিপুরা রাজ্যে চলিয়া আসে।

কোন নির্দিষ্ট দেশের জনসংখ্যা-বৃদ্ধির তুইটি সূত্র ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহাদের একটি স্বাভাবিক বৃদ্ধি অথবা নূতন জন্ম এবং অপরটি বাহির হইতে লোকের আগমন। ত্রিপুরার ক্ষেত্রে স্বাভাবিক বৃদ্ধির হার কত? হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, ১৯০১ হইতে ১৯১১ সালের মধ্যে মোট লোকবৃদ্ধির মাত্র শতকরা ১৫ ভাগ স্বাভাবিক বৃদ্ধি বলিয়া ধরা যায়। ১৯৪১-৫১ সালের মধ্যবর্তী সময়ে এই হার আরও কমিয়া শতকরা ছয় জনে দাঁড়ায়।

এইবার ১৯৫১ সালের সেন্সাস-নির্ধারিত জনসংখ্যার বিশ্লেষণ করা যাক। উক্ত হিসাবে রাজ্যের মোট অধিবাসীর সংখ্যা ৬,৩৯,০২৯। তন্মধ্যে পুরুষ ৩,৩৫,৫৮৯; স্ত্রীলোক ২,০৩,৪৪০। ত্রিপুরা প্রশাসনের স্বতন্ত্র হিসাবে মোট সংখ্যা ৬,৪৫,৭০৭ বলিয়া ধরা হইয়াছে। এই সাড়ে ছয় লক্ষের কাছাকাছি লোকসংখ্যার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ আদিবাসী। ইহাদের মোট সংখ্যা ২,৩৭,৯৫৩।

এই স্থলে একটি কথা বলিয়া রাখা ভাল। আদিবাসীদের সঠিক সংখ্যা নির্ণয় করা বরাবরই এক গুরুতর সমস্যা। ইহাদের প্রায় অর্ধেক জুমিয়া, অর্থাৎ প্রধানতঃ জুম চাষের উপর নির্ভরশীল।

জুমিয়ারা কোন নির্দিষ্ট স্থানে স্থায়িভাবে বসবাস করে না। ইহারা মূলতঃ যাযাবর, জুমের উপযুক্ত পার্বত্য জমির অন্বেষণে প্রতিবৎসর ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়ায়। এই ভাবে অতীতে ইহাদের অনেকে রাজ্যের বাহিরে পর্বতান্তরে চলিয়া গিয়াছে।

রাজনৈতিক কারণেও অনেক সময় আদিবাসিগণের রাজ্য ত্যাগ করিয়া যাইবার প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে, উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে কুকিদের বিরুদ্ধে অভিযানকালে ইংরেজ সরকার তদানীন্তন ত্রিপুরাধিপতির উপর কুলি-সংগ্রহের ভার অর্পণ করেন। এই দায়িত্বপালনের উদ্দেশ্যে ত্রিপুরার রাজা স্বীয় পার্বত্য প্রজাগণকে কুলির কার্যগ্রহণে বাধ্য করেন। এই অপমানকর রাজাজ্ঞার প্রতিবাদে অনেক আদিবাসী সেই সময় রাজ্য পরিত্যাগপূর্বক পার্বত্য চট্টগ্রামে চলিয়া যায়। ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে পার্বত্য চট্টগ্রামের সহকারী কমিশনারের বিবরণীতে প্রতিবৎসর ত্রিপুরা হইতে বহুসংখ্যক আদিবাসীর চট্টগ্রাম-পাহাড়ে আশ্রয় গ্রহণের উল্লেখ আছে।

এই অবস্থায় রাজ্যের মোট অধিবাসীর সংখ্যা নির্ভুলভাবে নির্ধারণ করা যে শক্ত, তাহাতে আর আশ্চর্য কি?

ত্রিপুরার মোট অধিবাসীদের মধ্যে ৪,০৯,৮১৯ জন এই রাজ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছে; বাকী ২,২৯,২১৬ জনের জন্মস্থান অন্যত্র। ইহার অর্থ এই যে, সমগ্র জনসমষ্টির মধ্যে শতকরা ৬৪ জন মাত্র ত্রিপুরার মাটিতে জন্মিয়াছে। বহিরাগতদের মধ্যে শতকরা ৯১ জন পূর্ব-বাঙলার কোন-না-কোন জেলায় জন্মগ্রহণ করিয়াছে। এই স্থলে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য এই যে, মোট ২,২৯,২১৬ জন বহিরাগতের

মধ্যে অর্ধেকের কিছু কম লোক, অর্থাৎ ১,০১,২০০ জন দেশ-বিভাগের পর এই রাজ্যে আশ্রয় লইয়াছে। অন্যরা দেশ-বিভাগের পূর্বেই ভাগ্য ফিরাইবার উদ্দেশ্যে জমির খোঁজে এখানে আসিয়াছে। ইহাদের মধ্যে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ভুক্ত লোকই রহিয়াছে। এই আগমন একদিনে ঘটে নাই। বহুদিন ধরিয়া অব্যাহত ধারায় চলিয়াছে। ইহার তাৎপর্য পরে আলোচনা করা হইবে।

**উদ্বাস্তু-সংখ্যা**

বর্তমানে ত্রিপুবার প্রতি দুইজন লোকের মধ্যে একজন উদ্বাস্তু। ১৯৫১ সালের সেন্সাস অনুসারে উদ্বাস্তুদের মোট সংখ্যা ১,০১,২০০ জন। তন্মধ্যে ৫৩,৮৭০ জন পুরুষ এবং ৪৭,৩২৯ জন স্ত্রীলোক। প্রকৃতপক্ষে দেশবিভাগেব পূর্বে ১৯৪৬ সাল হইতেই এই রাজ্যে ব্যাপক উদ্বাস্তু-আগমন সুরু হইয়াছিল। কোন্ বৎসর কতসংখ্যক শরণার্থী ত্রিপুরায় আসিয়াছে, নিচের হিসাব হইতে উহা বুঝা যাইবে :

| বৎসর | উদ্বাস্তু সংখ্যা | | | |
|---|---|---|---|---|
| | পূর্ব-বঙ্গ হইতে | | অনুল্লিখিত জেলা হইতে | |
| | পুরুষ | স্ত্রীলোক | পুরুষ | স্ত্রীলোক |
| ১৯৪৬ | ১'৫৯ | ১৫৫৮ | ... | ... |
| ১৯৪৭ | ৪২৩৩ | ৩৮৯১ | ৬০ | ৫ |
| ১৯-৮ | ৪৯৬৪ | ৪৫৯০ | ১৬ | ১০ |
| ১৯৪৯ | ৫৭০১ | ৫৮৭৪ | ৩৩ | ৪ |
| ১৯৫০ | ৩৬০৮৪ | ৩১০৬৭ | ২০১ | ৫০ |
| ১৯৫১ | ৮১৭ | ১২৭৯ | ২ | ১ |

বলা বাহুল্য, উপরের হিসাব সম্পূর্ণ নহে। ১৯৫১ সালের পরও পূর্ব-পাকিস্তানের বিভিন্ন জেলা হইতে উদ্বাস্তু-আগমন অব্যাহতভাবে চলিয়াছে। ১৯৫৮ সালের জানুয়ারী মাসে প্রকাশিত ত্রিপুরা প্রশাসনের এক বিবরণীতে ত্রিপুরার মোট উদ্বাস্তু-সংখ্যা ৩,৬৫,০০০ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। উক্ত হিসাব অনুসারে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত আগত উদ্বাস্তুর সংখ্যাই ১,৭৫,০০০। ইহার পর হইতে আগমনের বাৎসরিক হার নিম্নরূপ ঃ

| বৎসর | উদ্বাস্তুর সংখ্যা |
|---|---|
| ১৯৫১ | ২৩,০০০ |
| ১৯৫২ | ৮০,০০০ |
| ১৯৫৩ | ৩,২০০ |
| ১৯৫৪ | ৪,৭০০ |
| ১৯৫৫ | ১৭,৫০০ |
| ১৯৫৬ | ৫৭,৭০০ |
| ১৯৫৭ | ৩,৬০০ |

বলা বাহুল্য যাঁহারা আইনসঙ্গত পথে আসিয়াছেন উপরের হিসাবে কেবলমাত্র তাহাদিগকেই ধরা হইয়াছে। ইহারা ছাড়া জঙ্গল বা 'চোরা' পথে বহুসংখ্যক লোক এই রাজ্যে আশ্রয়লাভের উদ্দেশ্যে আসিয়াছেন। ইহাঁদের ধরিলে মোট উদ্বাস্তু-সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাইবে।

মোট জনসংখ্যার অনুপাতে ত্রিপুরা যতসংখ্যক শরণার্থীকে আশ্রয় দিয়াছে, এক পাঞ্জাব ছাড়া ভারতবর্ষের আর কোনও রাজ্যের

সঙ্গে তাহার তুলনা হয় না। পশ্চিম-বাঙলার মোট জনসংখ্যার শতকরা ৯ ভাগের কিছু-বেশী উদ্বাস্তু। আসামে আরও কম—শতকরা সোয়া তিন ভাগের কাছাকাছি। অবশ্য এই তুলনামূলক বিচারে পশ্চিম-বাঙলার প্রতি অবিচারের আশংকা থাকে। কারণ পশ্চিম-বাঙলায় উদ্বাস্তুদের আনুপাতিক হার ত্রিপুরার তুলনায় কম হইলেও এই কথা বিস্মৃত হইলে চলিবে না যে, মোট আয়তনের অনুপাতে ঐ রাজ্যে জনসমষ্টির চাপ অত্যধিক। প্রমাণস্বরূপ বলা যায় যে, ত্রিপুরার প্রতি বর্গমাইলে মাত্র ১৫৮ জন লোকের বাস। পক্ষান্তরে পশ্চিম-বাঙলায় লোকবসতির ঘনতা প্রতি বর্গমাইলে আটশতের বেশী।

ইহা সত্ত্বেও ত্রিপুরার উদ্বাস্তু-সমস্যার গুরুত্ব অস্বীকার করার উপায় নাই।

## শিক্ষিতের হার

১৯৩১ সালের সেন্সাস অনুসারে ত্রিপুরায় তৎকালীন মোট ৩,৮২,৪৫০ জন অধিবাসীর মধ্যে শিক্ষিতের সংখ্যা ছিল ১০,৮৬১ জন। সেই সময় প্রতি হাজারে মাত্র ২৮ জন ছিল সাধারণভাবে লেখা-পড়া-জানা ; ইংরেজী-শিক্ষিতের সংখ্যা ছিল এক হাজারে ৮ জন।

বিগত বিশ বৎসরে ( ১৯৩১-৫১ ) অবস্থার অনেক উন্নতি

ঘটিয়াছে। নিচের হিসাব হইতে এই উন্নতির চিত্র পাওয়া যাইবে ঃ

| বিভাগ | মোট জনসংখ্যা | শিক্ষিতের সংখ্যা | শিক্ষিতের শতকরা হার |
|---|---|---|---|
| সদর (আগরতলা শহর সহ) | ২২৩৪১৬ | ৫১২৯৬ | ২৩ |
| খোয়াই | ৫৫৫৬০ | ৭৯১৪ | ১৪.২ |
| কমলপুর | ৩০৩৭২ | ৩৪১৬ | ১১.২ |
| কৈলাসহর | ৭৫২৬৬ | ১০৯৩৫ | ১৪.৫ |
| ধর্মনগর | ৬৫৯০৩ | ১১৪৪১ | ১৭.৪ |
| সোনামুড়া | ৪৪৫৪৪ | ৩০৩৩ | ৬.৮ |
| উদয়পুর | ৫৮৪৭৭ | ৪৩০১ | ৭.৪ |
| অমরপুর | ২৮২৮০ | ১১৭৪ | ৪.২ |
| বিলোনীয়া | ৪০২০৯ | ৪৪৮১ | ১১.১ |
| সাব্রুম | ২৩৬৮০ | ২০৯৩ | ৮.৮ |

উপরের হিসাব অনুসারে রাজ্যের গড়পড়তা শিক্ষিতের হার ১৫.৫। বলা প্রয়োজন যে, এই খতিয়ান ত্রিপুরা প্রশাসন কর্তৃক প্রদত্ত রাজ্যের মোট জনসংখ্যার (৫,৪৫,৭০৭) উপর ভিত্তি করিয়া তৈরী হইয়াছে।

১৯৫১ সাল পর্যন্ত ত্রিপুরার বিভিন্ন স্থানে স্কুল ইত্যাদির হিসাব লইলে শিক্ষা-ক্ষেত্রে পূর্বোক্ত অগ্রগতি অস্বাভাবিক মনে হইতে পারে। স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পর বিগত দশ বৎসরে ত্রিপুরার শিক্ষা-ব্যবস্থার দ্রুত সম্প্রসারণের কথা পরে স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করা হইবে। আপাততঃ এই কথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, ১৯৩১-৫১ সালের

মধ্যবর্তী সময়ে যে অগ্রগতি লক্ষ্য করা যায়, তাহা পূর্ববর্তী রাজ্য-সরকারের সুনির্দিষ্ট শিক্ষানীতির ফল নহে। পূর্ববঙ্গের জেলাগুলি হইতে উদ্বাস্তু হিসাবে যাঁহারা এই রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে বহুসংখ্যক শিক্ষিত ব্যক্তি রহিয়াছেন। এই সকল "তৈয়ারী মানুষের" আগমনের ফলেই শিক্ষা-হারের নির্ণয়-সূচক রেখা উর্ধ্বগামী হইয়াছে। কারণ যাহাই হোক, লেখাপড়া-জানা লোকের সংখ্যাবৃদ্ধি রাজ্যের পক্ষে আনন্দের কথা সন্দেহ নাই।

এই প্রসঙ্গে আরও একটি বিষয় লক্ষণীয়। উপরের হিসাব হইতে দেখা যাইবে যে, রাজ্যের উত্তরাঞ্চল অপেক্ষা দক্ষিণ দিকের বিভাগগুলি শিক্ষা-ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত কম অগ্রসর। ইহার কারণ অনুমান করা সহজ। প্রথমতঃ যোগাযোগ-ব্যবস্থার দিক হইতে দক্ষিণাংশ উত্তরাঞ্চল হইতে পশ্চাৎপদ। দ্বিতীয়তঃ পূর্ববঙ্গ হইতে যে সকল উদ্বাস্তু এই রাজ্যে আসিয়াছেন, তাঁহারা প্রধানতঃ সদর এবং ধর্মনগর, কৈলাসহর, খোয়াই ইত্যাদি বিভাগে বসতি স্থাপন করিয়াছেন। ইহা ছাড়া পূর্ববঙ্গের যে অংশ ত্রিপুরার উত্তরাঞ্চলের সংলগ্ন রহিয়াছে তাহা শিক্ষাক্ষেত্রে অগ্রসর বলিয়া এই সকল বিভাগের সমতল অঞ্চলের স্থায়ী অধিবাসিগণ দেশ-বিভাগের পূর্বেই শিক্ষালাভের অধিকতর সুযোগ পাইয়াছিলেন।

পূর্বোক্ত দুইটি কারণ ছাড়া আরও একটি কারণ আছে। আদিবাসীদের আঞ্চলিক বসতি-বিন্যাস অনুধাবন করিলে জানা যাইবে যে, রিয়াং প্রভৃতি শিক্ষা-ক্ষেত্রে অনগ্রসর আদিবাসী-সম্প্রদায় প্রধানতঃ অমরপুর, বিলোনীয়া প্রভৃতি বিভাগে বাস

করে। পক্ষান্তরে শিক্ষায় অপেক্ষাকৃত অগ্রবর্তী ত্রিপুরাগণ প্রধানতঃ সদর ও খোয়াই বিভাগে দৃষ্ট হয়। ত্রিপুরার জুমিয়াদের বিরাট অংশ রিয়াং। যাহারা এখনও পর্যন্ত জীবিকা-ক্ষেত্রে আদিম যুগে রহিয়াছে, স্থায়ী ঘরবাড়ী বলিতে যাহাদের কিছুই নাই, তাহারা শিক্ষা-দীক্ষায় অনগ্রসর থাকিবে—ইহাতে আশ্চর্যের কিছু নাই।

**ধর্মমত**

ত্রিপুরার অধিকাংশ লোক হিন্দু-ধর্মাবলম্বী। সংখ্যা হিসাবে মোট জনসমষ্টির শতকরা ৭৫ জন হিন্দু। এই হিসাবের মধ্যে বাঙালী ও আদিবাসী উভয়ই আছে। হিন্দু-ধর্মাবলম্বী মোট লোক-সংখ্যার মধ্যে শতকরা ৫১ জন বাঙালী। লুসাই, কুকি ও গারোদের মধ্যে অনেকে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করিলেও অধিকাংশ আদিবাসী নিজেদের হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে। নিচের হিসাব হইতে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী লোক-সংখ্যার তুলনামূলক চিত্র পাওয়া যাইবে:

| | |
|---|---|
| হিন্দু | ৪৮০৬৬২ |
| মুসলমান | ১৩৬৯৪০ |
| বৌদ্ধ | ১৫৪০৩ |
| খ্রীষ্টান | ৫২৬২ |
| শিখ | ৩৫ |
| জৈন | ৩৬ |
| অন্যান্য | ৬৯১ |
| | মোট ৬,৩৯,০২৯ |

## ভাষা

ত্রিপুরার বৃহত্তম জনসমষ্টির মাতৃভাষা বাঙলা। অবশ্য অন্যান্য ভাষা-ভাষীর সংখ্যাও নগণ্য নহে। নিচে প্রধান প্রধান ভাষার হিসাব দেওয়া হইল :

| ভাষা | জন-সংখ্যা | |
|---|---|---|
| | ১৯৫১ | ১৯৩১ |
| বাঙলা | ৩৭৫৬৩৫ | ১৬৫৫৪০ |
| ত্রিপুরা | ১২৯৩৭৯ | ১৪৮২৯৮ |
| হিন্দী | ৩৭৯৭৯ | ১২৮০৪ |
| মণিপুরী | ১৯০৮৬ | ১৮৪৮৫ |
| হালাম | ১ ২৩০ | ১০৩৭০ |
| রিয়াং | ১৬৬৬৭ | × |
| চাকমা | ১১৬৭২ | ৫২২০ |
| গারো | ৩৩৭০ | ২০৪০ |
| লুসাই | ৩.২১ | ২০০০ |
| কুকি | ২৫৭৮ | ১৪৭০ |
| উড়িয়া | ৬৩৯৫ | ৫৪৫৭ |
| নেপালী | ৩০৯৩ | ২৩১৭ |
| মগ | ২২৫৩ | ৩৮৬৩ |
| তেলেগু | ১৪৪৮ | ১৯১৮ |
| অসমীয়া | ২৬৩ | ৪৬৭ |
| সাঁওতাল | ৮৪৮ | ২১৭৩ |
| খাসিয়া | ৪৮৭ | ২৩ |

এই তালিকা হইতে জানা যাইবে যে, এই রাজ্যের অর্ধেকের বেশী লোকের মাতৃভাষা বাঙলা। বাঙলার পরই ত্রিপুরা ভাষার স্থান। এই ভাষা ত্রিপুরাদের মাতৃভাষা। পার্বত্য চট্টগ্রাম ছাড়া ত্রিপুরার বাইরে ইহাদের আর কোথাও দেখা যায় না। এই কারণে ত্রিপুরা ভাষাকে সম্পূর্ণ ভাবে স্থানীয় ভাষা বলা যাইতে পারে। প্রসঙ্গত যাহা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য তাহা এই: ১৯৩১-৫১ সালের মধ্যবর্তী সময়ের মধ্যে বাঙলা ভাষা-ভাষীর সংখ্যা প্রভূত বৃদ্ধি পাইয়াছে। অন্যান্য প্রায় সকল ভাষা সম্পর্কেও এই কথা প্রযোজ্য। কিন্তু এই সময়ের মধ্যে ত্রিপুরাদের মোট জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইলেও ত্রিপুরা ভাষা-ভাষীয় সংখ্যা কমিয়াছে। ইহার কারণ কি? সম্ভবতঃ সহর ও সহর-সংলগ্ন স্থানে অবস্থানকারী লেখাপড়া-জানা ত্রিপুরাদের এক উল্লেখযোগ্য অংশ বিগত সেন্সাস গ্রহণের সময় স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া বাঙলাকে নিজেদের মাতৃভাষা বলিয়া লিপিবদ্ধ করাইয়াছেন। উদাহরণ-স্বরূপ ঠাকুর ব্যক্তিদের কথা বলা যাইতে পারে। ইঁহারা বাঙালী না হইলেও নিজেদের মধ্যে কথাবার্তায় বাঙলা ভাষাই ব্যবহার করিয়া থাকেন।

ত্রিপুরার জনসমষ্টির মোটামুটি পরিচয় পাওয়া গেল। তোমরা প্রশ্ন করিবে ঃ এই যে সাড়ে ছয় লক্ষ অধিবাসী, তাহাদের ধর্মমত, ভাষা ও শিক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা হইল—কিন্তু তাহাদের জীবিকার পরিচয় ত লওয়া হইল না, জানা হইল না তাহাদের মধ্যে কতসংখ্যক গ্রামবাসী, সহরেই বা বাস করেন কত জন?

পরবর্তী অধ্যায়ে এই প্রসঙ্গেই আলোচনা হইবে।

# ষষ্ঠ অধ্যায়

## বাস্তু ও জীবিকা

ত্রিপুরা পল্লী-প্রধান। বিগত শতাব্দীর শেষার্ধ পর্যন্ত ইংরেজ লেখকগণ রাজধানী আগরতলাকে একটি মাঝারি আকারের গ্রাম বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। আজ আর আগরতলাকে গ্রাম বলা যায় না। আধুনিক সহরের প্রায় সকল বৈশিষ্ট্য লইয়া ইহা উত্তরোত্তর শ্রীমণ্ডিত হইয়া উঠিতেছে। ভারতবর্ষের সকল অংশের নরনারী জীবিকার অন্বেষণে বিপুল সংখ্যায় এখানে আসিয়া ভিড় জমাইয়াছেন। তবু ত্রিপুরায় সহর হিসাবে আগরতলাই এক ও অদ্বিতীয়। শাসন-কার্যের সুবিধার জন্য সমস্ত রাজ্যকে ১০টি বিভাগ বা মহকুমায় ভাগ করা হইয়াছে। কিন্তু এক সদর ছাড়া এই সকল বিভাগীয় শাসন-কেন্দ্রগুলিকে সহর আখ্যা দেওয়া যায় না। ১৯৫১ সালের সেন্সাস অনুসারে ইহাদের বড়জোর আধা-সহর বলা যায়।

বিভাগগুলির নাম ও লোক-সংখ্যা নিম্নরূপ :

| | | |
|---|---|---|
| সদর | ... | ২২৩৪১৬ |
| খোয়াই | ... | ৫৫৫৬০ |
| কৈলাসহর | ... | ৭৫২৬৬ |
| কমলপুর | ... | ৩০৩৭২ |
| ধর্মনগর | ... | ৬৫৯০৩ |
| সোনামুড়া | ... | ৪৪৫৪৪ |
| উদয়পুর | ... | ৫৮৪৭৭ |
| অমরপুর | ... | ২৮২৮০ |
| বিলোনীয়া | ... | ৪০২০৮ |
| সাব্রুম | ... | ২৩৬৮০ |

এই সঙ্গে বিভাগীয় কেন্দ্রগুলির জনসংখ্যাও লক্ষণীয় :

| | | |
|---|---|---|
| সদর (আগরতলা) | ... | ৪২৫৯৫ |
| খোয়াই | ... | ৫১৫৫ |
| কৈলাসহর | ... | ৩৪৮৬ |
| কমলপুর | ... | ১০৬৫ |
| ধর্মনগর | ... | ৫৩০২ |
| সোনামুড়া | ... | ২২৯৭ |
| উদয়পুর | ... | ৫৪৫৯ |
| অমরপুর | ... | ১৫১৪ |
| বিলোনীয়া | ... | ৪১৮৬ |
| সাব্রুম | ... | ১১৮৭ |

## পল্লী-প্রাধান্য

১৯৫১ সালের সেন্সাস অনুসারে ত্রিপুরায় সহর ও গ্রামের লোক-সংখ্যার আনুপাতিক হার ১:১৪। ইহার অর্থ, সহরবাসী প্রতি এক জন লোকের পাশাপাশি ১৪ জন গ্রামে বাস করে। আসামে এই আনুপাতিক হার ১:২১ ; মণিপুরে ১:১০।

আরও পরিষ্কার করিয়া বলিতে গেলে, ত্রিপুরার মোট জনসমষ্টির শতকরা ৯৩·৩ জন গ্রামবাসী। ইহারা ৫৪৫৫টি ছোট-বড় গ্রামে ছড়াইয়া আছে। এই হিসাবের মধ্যে সমতল অঞ্চলের গ্রামগুলি যেমন রহিয়াছে, তেমনি পার্বত্য বস্তী অথবা 'পাড়া'ও ধরা হইয়াছে। পল্লী-সমাজের পূর্ণ চিত্র পাইতে হইলে গ্রামগুলির পরিচয় নেওয়া প্রয়োজন।

এই দিক হইতে বিচার করিলে নিচের তথ্যগুলি গুরুত্বপূর্ণ:

১। (ক) ৫০০জনের কম লোক বাস করে এমন গ্রামের সংখ্যা : ৩২৬৭

(খ) এই শ্রেণীর গ্রামে বাসকারী মোট জনসংখ্যা : ৪,৩২,৩৯৬

২। (ক) ৫০০-১০০০ লোক বাস করে এমন গ্রামের সংখ্যা : ১৩১

(খ) এই শ্রেণীর গ্রামে বাসকারী মোট জনসংখ্যা : ৯৭০৫৮

৩। (ক) ১০০০-২০০০ লোক বাস করে এমন গ্রামের সংখ্যা : ৪০

(খ) এই শ্রেণীর গ্রামে বাসকারী মোট জনসংখ্যা : ৫২৭৩৫

৪। (ক) ২০০০-৫০০০ লোক বাস করে এমন গ্রামের সংখ্যা : ৫

(খ) এই শ্রেণীর গ্রামে বাসকারী মোট জনসংখ্যা : ১৪২৪৫

উক্ত হিসাব বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, মোট পল্লীবাসীর শতকরা ৭২·৫ জন ৫০০ লোকের কম বসতিপূর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রামে বাস করে। এক-চতুর্থাংশ থাকে ৫০০-২০০০ জনের মাঝারি আকারের গ্রামে। ২০০০-৫০০০ লোকের বসতিপূর্ণ গ্রামের সংখ্যা নিতান্ত নগণ্য এবং পাঁচ হাজারের অধিক লোক বাস করে এমন কোন গ্রামের অস্তিত্ব একেবারেই নাই।

হিসাবটা তাৎপর্যপূর্ণ সন্দেহ নাই। পার্শ্ববর্তী পূর্ববাঙলার মত ত্রিপুরার পল্লীসমাজ ঘন সন্নিবদ্ধ নহে—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভগ্নাংশে বিভক্ত। রাজ্যের মোট জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ অরণ্যচারী আদিবাসী, এই কথা স্মরণ রাখিলে ইহাতে বিস্মিত হইবার কোন কারণ নাই।

**বাস্তুভিটার খতিয়ান**

গ্রাম ও সহরে লোকসংখ্যার আনুপাতিক হিসাব লওয়ার সঙ্গে বাস্তু বা গৃহ-সম্পর্কিত অবস্থাও আলোচনার যোগ্য।

বিগত সেন্সাস বিবরণীতে এই বিষয়ে প্রদত্ত তথ্য বিশ্লেষণ

করিলে দেখা যায়, ১৯২১ হইতে ১৯৫১ সাল পর্যন্ত ত্রিশ বৎসরে সমগ্র ত্রিপুরার লোক-সংখ্যা যে হারে বৃদ্ধি পাইয়াছে তদনুযায়ী মোট গৃহ-সংখ্যা বাড়ে নাই। নিচে প্রতি ১০০ বর্গমাইলে লোক ও গৃহ-সংখ্যা-বৃদ্ধির তুলনামূলক চিত্র দেওয়া হইল :

| | ১৯২১-৩০ | ১৯৩১-৪০ | ১৯৪১-৫০ |
|---|---|---|---|
| লোক-সংখ্যা : | ২৫·৬ | ৩৪ ১ | ২৪·৬ |
| গৃহ-সংখ্যা : | ২৬·৭ | ২৩ ৬ | ২৪·৩ |

গ্রামাঞ্চলের অবস্থা ততটা উদ্বেগজনক না হইলেও, সহর-এলাকায় ( আগরতলা ) গৃহ-সমস্যা তীব্র আকারে দেখা দিয়াছে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বলা যায়, ১৯১১ সালে গৃহ-প্রতি লোক-সংখ্যা ছিল ৫·২ জন। ১৯৫১ সালে এই সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া ১০ জনে দাঁড়ায়। ইহার অর্থ, বিগত ত্রিশ বৎসরে আগরতলা সহরে প্রাপ্তব্য গৃহের উপর চাপ দ্বিগুণ বাড়িয়াছে। সহরের জনস্বাস্থ্য ইত্যাদির কথা বিবেচনায় অবস্থাটা গুরুতর সন্দেহ নাই।

## জীবিকার হিসাব

বৃত্তি হিসাবে রাজ্যের মোট অধিবাসীদের কৃষিজীবী ও অ-কৃষিজীবী এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। জনসংখ্যার শতকরা ৭৫·৩ ভাগ মুখ্যতঃ কৃষির উপর নির্ভরশীল। শতকরা প্রায় ২৫ জন অ-কৃষিজীবী।

কৃষিজীবী বলিলেই এই শ্রেণীভুক্ত সমুদয় লোকের জীবন ও জীবিকা সম্পর্কে সম্যক ধারণা হয় না। কারণ আর্থিক দিক হইতে বিভিন্ন অবস্থার ব্যক্তিদের লইয়া উক্ত কৃষি-বর্গ গঠিত। কথাটা

আরও একটু পরিষ্কার করিয়া বলা দরকার। যাহাদের জমি আছে অথচ স্বয়ং চাষ-আবাদ করে না, অপরের পরিশ্রম-লব্ধ ফসলের আয় অথবা খাজনা ভোগ করে, তাহাদের পাশাপাশি ভাগচাষী কিংবা ভূমিহীন ক্ষেত-মজুরদের কথা মনে রাখিলে বক্তব্যটা বুঝা সহজ হইবে। পরশ্রম-ভোগী জমিদার, স্বল্প আয়ের ভাগচাষী অথবা বর্গাদার এবং নিঃস্ব চাষী—ইহারা সকলেই কৃষির উপর নির্ভরশীল। ইহাদের সকলকে লইয়াই কৃষিজীবী শ্রেণী গঠিত। অথচ ইহাঁরা পরস্পর হইতে কত পৃথক, ইহাদের মধ্যে ব্যবধান কত বিপুল !

কৃষির উপর নির্ভরশীল লোকদের চারিটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায় ; যথা—

(ক) মালিক-চাষী ও তাহাদের পোষ্যবর্গ।

(খ) সেই সকল কৃষক যাহারা সম্পূর্ণ ভাবে অথবা প্রধানতঃ অপরের জমি চাষ করে এবং তাহাদের পোষ্যবর্গ।

(গ) ক্ষেত-মজুর এবং তাহাদের পোষ্যবর্গ।

(ঘ) চাষ-আবাদের সঙ্গে সম্পর্কহীন জমিদারগণ এবং তাহাদের পোষ্যবর্গ।

ত্রিপুরার কৃষি-বর্গভুক্ত মোট জনসংখ্যার শতকরা কতজন উপরোক্ত চারিটি শ্রেণীর কোন্‌টিতে পড়ে, নিচের হিসাব হইতে তাহা বুঝা যাইবে ;

| | | |
|---|---|---|
| "ক" শ্রেণী .. | ... | ৫৯.৮ জন |
| "খ" শ্রেণী .. | ... | ৮.৮ জন |
| "গ" শ্রেণী .. | ... | ৪.৮ জন |
| "ঘ" শ্রেণী .. | ... | ১৯ জন |

দেখা যাইতেছে যে, ত্রিপুরার কৃষি-জীবীদের মধ্যে মালিক-চাষীগণ সংখ্যাগরিষ্ঠ। পক্ষান্তরে খাজনা-ভোগী জমিদারদের সংখ্যা নিম্নতম। কোন শ্রেণীর হাতে কত পরিমাণ জমি আছে তাহার সঠিক হিসাব পাওয়া যায় না। কিন্তু মজুর খাটাইয়া অনেক জমি একত্রে চাষ করে এমন ধনী কৃষকের সংখ্যা যে নগণ্য, ইহা ত্রিপুরার ভূমি-ব্যবস্থার সমালোচকগণও স্বীকার করেন। এই স্থলে উল্লেখযোগ্য যে, মালিক-চাষীদের অধিকাংশের জমির আয়তন ক্ষুদ্র। এই ক্ষুদ্রায়তনের জমি ( uneconomic holding ) হইতে সম্বৎসরের খোরাক এবং অন্যান্য অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্য-সামগ্রীর সংস্থান করা দুঃসাধ্য।

পূর্বেই বলা হইয়াছে, ত্রিপুরার মোট অধিবাসীর মধ্যে শতকরা ৯৩ জনের বেশী গ্রামে বাস করে। সহরবাসীদের মধ্যেও একটি উল্লেখযোগ্য অংশ কৃষির উপর নির্ভরশীল। ইহাদের সংখ্যা শতকরা ১৩৩ জন। অন্যদিকে সহরবাসী অ-কৃষিজীবীর সংখ্যা শতকরা প্রায় ৮৭ জন।

অ-কৃষিজীবী জনসংখ্যার শতকরা ২৩ জন নানাবিধ ছোট-খাট ব্যবসায়ে লিপ্ত অথবা অফিস ইত্যাদিতে নিযুক্ত আছে। সহরের উকিল, ডাক্তার, দোকানদার, সরকারী কর্মচারী প্রভৃতি এই শ্রেণীভুক্ত। ইহাদের মধ্যে শতকরা ৬৭ জন উপার্জনহীন পোষ্য। এই হিসাব হইতে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের লোকদের আর্থিক অবস্থা আন্দাজ করা যায়।

অ-কৃষিজীবীদের এক ক্ষুদ্র অংশ, অর্থাৎ শতকরা প্রায় ১৩ জন ছোট ও কুটির-শিল্পের উপর নির্ভরশীল। ইহা নিঃসন্দেহে শিল্প-ক্ষেত্রে ত্রিপুরার অনগ্রসরতার প্রমাণ। রাজ্যের অধিবাসীদের আর্থিক অস্বাচ্ছন্দ্যের অন্যতম প্রধান কারণও ইহাই।

# সপ্তম অধ্যায়

## কৃষি, বাণিজ্য, শিল্প

ত্রিপুরার প্রতি একশত জন অধিবাসীর মধ্যে ৯০ জনের বেশী গ্রামে বাস করে—এই তথ্য ইতিপূর্বে পাইয়াছি এবং সেই সঙ্গে ইহাও জানিয়াছি যে, শতকরা ৭৫ জনের বেশী লোক প্রত্যক্ষভাবে কৃষির উপর নির্ভরশীল। পশ্চিম বাঙলার শতকরা ৫৮ জন কৃষির উপর নির্ভর করে। চাষ-আবাদ ত্রিপুরার বার আনা মানুষের প্রধান জীবিকা। রাজ্যের আর্থিক মেরুদণ্ড কৃষি। বিশেষজ্ঞদের মতে কৃষির উপর এই অতিরিক্ত নির্ভরশীলতা বিপজ্জনক।

ত্রিপুরার পক্ষে অবস্থা আরও গুরুতর। একদিকে শিল্প ইত্যাদি বিকল্প জীবিকার অভাব যেমন রাজ্যের অর্থনীতিকে এক অচলায়তনের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, তেমনি যে কৃষির উপর এত লোকের ভরসা, তাহার অবস্থাও নিতান্ত শোচনীয়। এই দুর্বলতার লক্ষণগুলি সুস্পষ্ট। এইগুলি একে একে আলোচনা করা হইবে।

জনসমষ্টির পরিচয়-প্রসঙ্গে দেখিয়াছি, বাঙলা দেশ হইতে বহু-সংখ্যক লোক দেশবিভাগের পূর্বেই ত্রিপুরায় স্থায়িভাবে বসবাস আরম্ভ করিয়াছে। ইহারা প্রধানতঃ কৃষিজীবী। ইহাদের মধ্যে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকই আছে। তীব্র কৃষি-সংকটের মুখে "অনাবিষ্কৃত" জমির অনুসন্ধানে ইহারা পূর্ববাঙলার জেলাগুলি হইতে আসিয়া ত্রিপুরা রাজ্যে ভিড় জমাইয়াছে। অনেকে সুদূর আসামেও গিয়াছে। জীবিকার বিকল্প পথ খোলা না থাকায় পুনরায়

কৃষিকে আশ্রয় করিয়া জীবন-সংগ্রামে প্রবৃত্ত হওয়া ইহাদের পক্ষে অপরিহার্য ছিল।

এই বিপুল-সংখ্যক মানুষের আগমন ত্রিপুরায় বিস্তর অনাবাদী জমির অস্তিত্ব প্রমাণ করে। বিগত ত্রিশ বৎসরে জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধির ফলে অবস্থার অনেক পরিবর্তন হইয়াছে। তথাপি রাজ্যের মোট কর্ষণ-যোগ্য জমির অনুপাতে ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় ত্রিপুরায় কৃষিকার্যের প্রসার কম হইয়াছে বলা যায়।

সার্ভেয়ার-জেনারেলের হিসাব অনুসারে ত্রিপুরার মোট ভৌগোলিক আয়তন ২৫,৮০,২৮৮ একর ; মোট জনসংখ্যা ৬,৩৯,০২৯। এই তথ্য আমাদের জানা। তবু বর্তমান প্রসঙ্গ আলোচনায় অগ্রসর হইবার পূর্বে এইগুলি পুনরায় স্মরণীয়। রাজ্যের মোট আয়তনকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে ভাগ করিয়া যদি সকল অধিবাসীদের মধ্যে সমান ভাবে বণ্টন করিয়া দেওয়া যায়, তবে জন প্রতি যে ভাগ পড়ে তাহার পরিমাণ ৪·০৪ একর ; ২৫,৮০,২৮৮ একরের মধ্যে ভূ-সংস্থানের দিক হইতে ব্যবহারযোগ্য ( topographically usable ) জমির পরিমাণ ১৭,৭৯,৪৫৬ একর। এই সংখ্যাকে মোট জনসংখ্যা দ্বারা ভাগ করিলে প্রতিটি লোকের ভাগে ২·৭৮ একর পরিমাণ জমি পড়ে। এই মাথাপিছু হার পূর্ব-ভারতের অন্যান্য রাজ্য অপেক্ষা বেশী। নিচের হিসাবটা লক্ষ্য করিলে ইহা বুঝা যাইবে।

| রাজ্য | ভূ-সংস্থানের দিক হইতে ব্যবহার-যোগ্য মাথাপিছু জমি ( একর হিসাব ) |
|---|---|
| আসাম | ২·৪৮ |
| পশ্চিমবঙ্গ | ০·৭৩ |

| | |
|---|---|
| বিহার | ০˙৮৯ |
| উড়িষ্যা | ১˙৭৫ |
| মনিপুর | ২˙৬৯ |
| ত্রিপুরা | ২˙৭৮ |

ভূ-সংস্থানের দিক হইতে ( topographically ) ব্যবহারযোগ্য সকল জমিই চাষ-আবাদের কাজে আসে না। কৃষিকার্যে ব্যবহারযোগ্য জমির পরিমাণ ৯,৯৪,০০০ একর। তন্মধ্যে ব্যবহৃত জমির পরিমাণ ৪,৭৯,০০০ একর। ত্রিপুরা প্রশাসন কর্তৃক প্রকাশিত হিসাব অনুসারে এই অঙ্কের পরিমাণ আরও কম। তাঁহাদের মতে ১৯৫২-৫৩ সালে ৩,৯১,৮৪০ একর জমিতে চাষ-আবাদ হইয়াছে ; ১৯৫৩-৫৪ সালে এই সংখ্যা সামান্য হ্রাস পাইয়া ৩,৯০,৮৭০তে দাঁড়ায়। প্রথমোক্ত হিসাব ( ৪,৭৯,০০০ একর ) ধরিলে রাজ্যের মোট আবাদযোগ্য জমির মাত্র ৪৮˙২ শতাংশ কৃষিকার্যে ব্যবহৃত হয়। অন্যান্য রাজ্যের সঙ্গে তুলনা করিলে প্রকৃত অবস্থা উপলব্ধি করা সহজ হইবে। নিচে পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলির সঙ্গে তুলনা-মূলক চিত্র দেওয়া হইল :

| রাজ্য | অবাদযোগ্য জমির কতভাগ কৃষিকার্যে ব্যবহৃত হইয়াছে |
|---|---|
| আসাম | ৬৫˙৫ |
| পশ্চিমবঙ্গ | ৮০˙৮ |
| বিহার | ৬৬˙৭ |
| উড়িষ্যা | ৬০˙১ |
| মনিপুর | ৬৯˙৮ |
| ত্রিপুরা | ৪৮˙২ |
| পূর্ব্বাঞ্চল রাজ্যসমূহ ( একত্রে ) | ৬৭˙১ |
| ভারতবর্ষ ( সমগ্রভাবে ) | ৬৭ ৫ |

এই সামগ্রিক অবস্থার পাশাপাশি একটি খণ্ড-চিত্রও উপস্থিত করিতে হয়। স্থূলভাবে বলিলে চিত্রটি এই : ভূ-সংস্থানের দিক হইতে রাজ্যের মোট আয়তনকে সমতল এবং পাহাড়ী বা টিলাভূমি এই দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়। 'লুঙা' সহ সমতল জমির পরিমাণ ১৬,২০,৫৪৪ একর ; টিলা-জমির পরিমাণ ৯,৫৯,৭৪৪ একব। উপরে যে পরিমাণ আবাদযোগ্য জমির উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহার মধ্যে সমতল ও টিলা এই দুই শ্রেণীর জমিই আছে। চায-আবাদের সুবিধা-অসুবিধার দিক হইতে সমতল অঞ্চলের সমুদয় জমিকেও এক শ্রেণীভুক্ত করা যায় না। আলোচ্য প্রসঙ্গে এই প্রভেদটা অবশ্য গৌণ। আসল কথা, বাহির হইতে কৃষিকার্যের উদ্দেশ্যে যাহারা এই রাজ্যে আসিয়াছে, তাহারা প্রধানতঃ সমতল অঞ্চলের উৎকৃষ্ট জমিতে ভিড় জমাইয়াছে। ইহা স্বাভাবিক। ফল যাহা হইয়াছে তাহা এই : কর্ষণযোগ্য বিস্তীর্ণ এলাকা অনাবাদী পড়িয়া থাকিলেও জনসংখ্যা-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সমতল জমির উপর চাপ বাড়িয়াছে। আঞ্চলিক ভিত্তিতে জনসংখ্যা বণ্টনেব হিসাব লইলে এই অবস্থার মোটামুটি পরিচয় পাওয়া যাইবে।

ত্রিপুরায় প্রতি বর্গমাইলে মাত্র ১৫৭ জন লোক বাস করে। ইহা গড়পড়তা হিসাব –এই কথা মনে রাখা প্রয়োজন। রাজ্যের মোট জনসমষ্টিকে মোট আয়তন দ্বারা ভাগ করিয়া এই সংখ্যা নির্ণয় করা হইয়াছে। অনেক জায়গায় লোকবসতির ঘনতা এই সংখ্যা অপেক্ষা অনেক বেশী, আবার কোথাও অনেক কম। মোটামুটি ভাবে বলিতে গেলে রাজ্যের অভ্যন্তর-ভাগের তুলনায় উত্তর-পশ্চিম ভাগ অধিকতর বসতিপূর্ণ। উদাহরণ-স্বরূপ, সদর ও ধর্মনগর বিভাগে

প্রতি বর্গ-মাইলে যথাক্রমে ৪৭১ ও ২৪০ জন লোক বাস করে। পক্ষান্তরে অমরপুর বিভাগে বসতির ঘনতা মাত্র ৫৪ জন।

এই হিসাব হইতে অবশ্য আমাদের মূল বক্তব্য খুব পরিষ্কার হইল না। বিভাগ হিসাবে লোকবসতির খতিয়ান লইলে সমগ্রভাবে সমতল ও পাহাড়ী ভূমিতে লোকবসতির ঘনতার আনুপাতিক হিসাব পাওয়া যায় না। কারণ ভূ-সংস্থানের দিক হইতে সমগ্র রাজ্যকে যেমন, প্রতিটি বিভাগকেও তেমনি সমতল ও টিলা এই দুই ভাগে ভাগ করা যায়। তথাপি অমরপুর বিভাগের তুলনায় সদর কিংবা ধর্মনগব বিভাগ যে সমতলভূমি-প্রধান তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায়। তহশীল ভিত্তিতে রচিত নিচের হিসাবটি লক্ষ্য করিলে সমতল ও পাহাড় অঞ্চলেব মধ্যে জনসংখ্যাব অসমান বণ্টনের স্পষ্টতর চিত্র পাওয়া যাইবে :

| তহশীলের নাম | লোক-সংখ্যা |
| --- | --- |
| পুরাতন আঁগরতলা | ৩৫৫৩৮ |
| বিশালগড় | ১৯১০৫ |
| টাকারজলা | ৩৮৩১ |
| চড়িলাম | ২১৩৪১ |
| কুলাইহাওর | ১০০৩৪ |
| আশারাম বাড়ী | ৪৫৯২ |
| কল্যাণপুর | ২৭৪০২ |
| ফটিকরায় | ২৭৩৭০ |
| কাঞ্চনপুব | ১৬৬৪২ |
| অম্পিনগর | ৬৪২৮ |

| তহশীলের নাম | লোক-সংখ্যা |
|---|---|
| কাঠালিয়া | ৩১৭৩ |
| মোহরিপুর | ১৩২৭৩ |
| পুরান রাজবাড়ী | ১২২৩ |
| রাধানগর | ৫৫৫ |
| সিদ্ধিনগর | ৭৯৬ |
| কুর্তি | ১০৪৪৮ |
| লঙ্গাই | ৪৯০২ |
| আমলিঘাট | ২৩৮২ |
| সমরেন্দ্রগঞ্জ | ৪৬২ |

জনসমষ্টির এই অসমান বণ্টন সত্ত্বেও, অর্থাৎ জনসংখ্যা-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে টিলাজমির তুলনায় সমতলভূমিতে অধিকতর চাপ পড়িলেও গ্রামাঞ্চলের লোকধারণের ক্ষমতা নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে, এমন কথা বলার মত অবস্থা এখনও সৃষ্টি হয় নাই। বরং সমগ্র ভাবে ত্রিপুবার কৃষি সম্প্রসারণের প্রভূত সুযোগ রহিয়াছে— উপরের তথ্যগুলি বিশ্লেষণ করিলে এই সিদ্ধান্তেই আসিতে হয়। কৃষি-ব্যবস্থার পুনর্গঠনের দিক হইতে বিচার করিলে কর্ষণযোগ্য পতিত জমি চাষ-আবাদের কাজে লাগান অপরিহার্য কর্তব্য।

কৃষি সম্প্রসারণের ( agricultural extension ) সঙ্গে সঙ্গে চাষের গভীরতার ( intensive cultivation ) দিকে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। এই জন্য চাই উন্নত কর্ষণ-প্রণালী, চাই উন্নত ধরনের যন্ত্রপাতি, চাই সুসংগঠিত সেচ-ব্যবস্থা। এই দিক দিয়া ত্রিপুরার

অবস্থা কী ? এই প্রশ্নের বিস্তৃত আলোচনা আরম্ভ করার পূর্বে একটি বিষয় মনে রাখা দরকার।

বিষয়টি এই : রাজ্যের মোট কৃষিজীবী জনসংখ্যার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ আদিবাসী। এই আদিবাসীদের মধ্যে সমতল অঞ্চলের অনুরূপ হালচাষের কিছু কিছু প্রচলন থাকিলেও ইহাদের বৃহত্তম অংশ জুমিয়া অর্থাৎ জুম চাষের উপর নির্ভরশীল। জুমিয়া পরিবারের সংখ্যা ২০,০০০। ত্রিপুরা প্রশাসন কর্তৃক প্রকাশিত বিবরণ হইতে জানা যায় যে, ১৯৫৩-৫৪ সালে মোট ধানী জমির পরিমাণ ছিল ৩,৫২,৮৮১ একর। তন্মধ্যে জুম প্রথায় চাষ হইয়াছে এমন জমির পরিমাণ ৫৭,২৮৯ একর।

জুমচাষের পদ্ধতিটি একেবারে আদিম। প্রথমতঃ একটি পাহাড় বা টিলা বাছিয়া লইয়া ইহার গাত্রস্থ গাছপালা কাটিয়া ফেলা হয়। গাছপালাগুলি রৌদ্রে পুড়িয়া শুকাইয়া উঠিলে আগুন ধরাইয়া দেওয়া হয়। তারপর বর্ষা আগমনের সঙ্গে সঙ্গে সুরু হয় বীজবপন। বীজবপনের রীতিও অদ্ভুত। দা অথবা "টাকল" দ্বারা জমি খুঁড়িয়া একই গর্তের মধ্যে ধান, কার্পাস ইত্যাদি যাবতীয় বীজ একসঙ্গে পুতিয়া দেওয়া হয়। যথাসময়ে ফসলগুলি পরিপক্ক হইলে একের পর এক কাটিয়া ঘরে তোলা হয়। এক বৎসর যে টিলায় জুম-চাষ করা হয়, পরবর্তী বৎসর তাহাতে আর আবাদ হয় না—জুমিয়াগণ নূতন জমির সন্ধানে অন্যত্র চলিয়া যায়।

আদিবাসীদের মধ্যে জুম-চাষের ব্যাপক প্রচলন ইদানীং বিশেষজ্ঞদের দুশ্চিন্তার কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই দুশ্চিন্তার কারণ একাধিক। প্রথমতঃ যাহারা কোন নির্দিষ্ট জমিতে চাষ-আবাদ
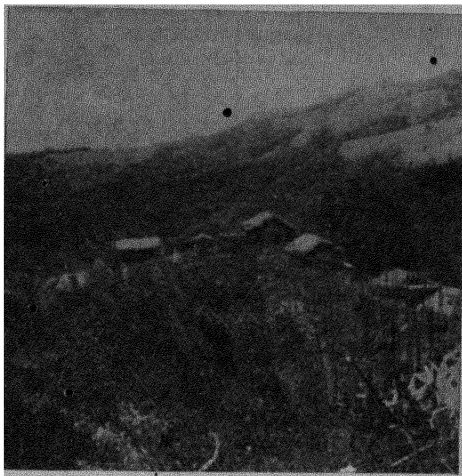
"চিত্ত যেথা ভয়শূন্য উচ্চ যেথা শির": একটি আদিবাসী গ্রাম বা 'পাড়া'

সাধারণ আকারের একটি 'টঙ্' ঘর। আদিবাসীদের অধিকাংশই এই ধরনের ঘরে বাস করিতে অভ্যস্ত
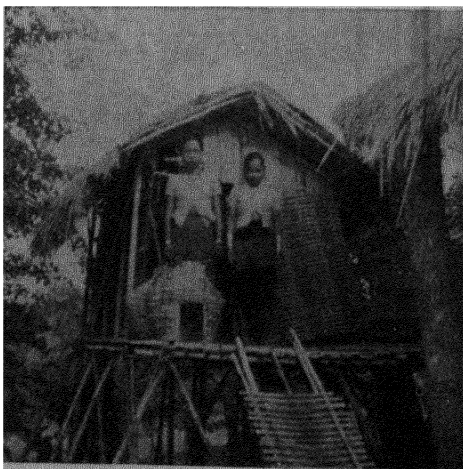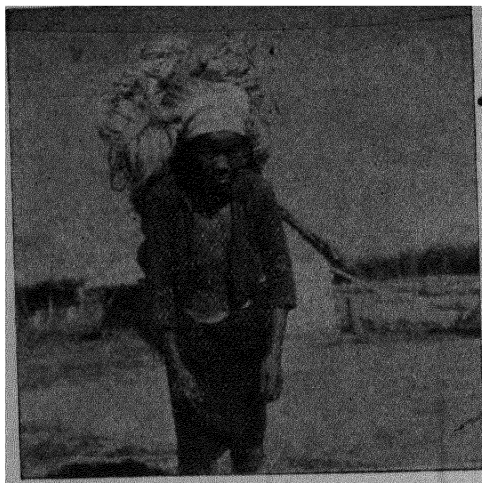
হাটের পথে

জুমের ফসল লইয়া আদিবাসী মেয়েরা বিক্রয়ার্থ হাটে সমবেত হইয়াছে
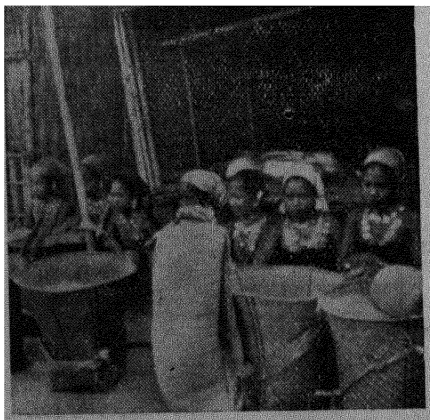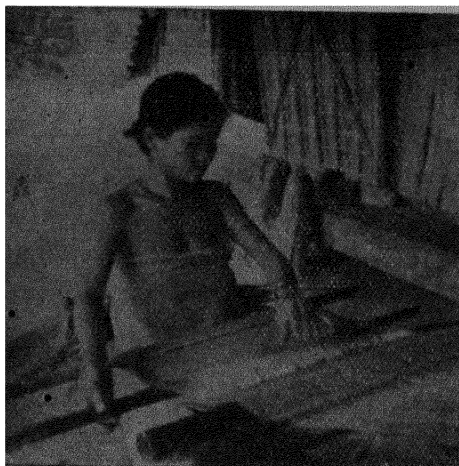
বয়ন-রতা আদিবাসী
রমণী
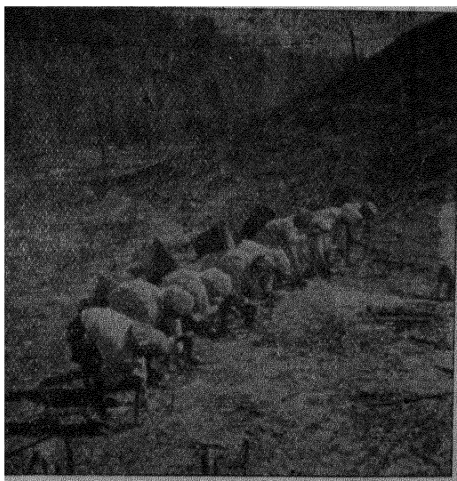
জুম-চাষের দৃশ্য

ডম্বুরু তীর্থ ঃ দুর্গম পার্বত্য-পথ অতিক্রম করিয়া সহস্র সহস্র নরনারী প্রতিবৎসর এই স্থানে পুণ্য-স্নানের উদ্দেশ্যে সমবেত হন

দেবতামুড়ার নিকট গোমতী নদীর দৃশ্য
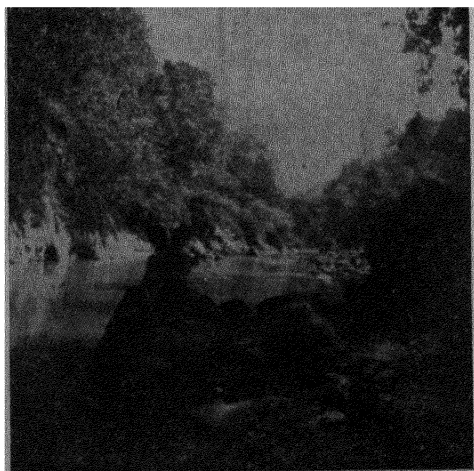
চীন-ভারত মৈত্রীর প্রতীক : প্রধান মন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু ত্রিপুরার এই হস্তীটি উপহারস্বরূপ চীনদেশে প্রেরণ করিয়াছেন

করে না, তাহাদের কোন নির্দিষ্ট বাসস্থানও থাকিবার কথা নয়। আর যাহাদের কোন স্থায়ী বসতি নাই তাহারা জীবনযাত্রার আধুনিক উপকরণ ভোগ করিতে পারিবে না—ইহাই স্বাভাবিক। যাযাবর মানুষের নিকট স্কুল-কলেজ, হাসপাতাল ইত্যাদির মূল্য কি? ফলে যুগ যুগ ধরিয়া ইহারা অজ্ঞানতার অন্ধকারে ডুবিয়া থাকে—নানাবিধ রোগের আক্রমণে ইহাদের জীবনপুষ্প অকালে ঝরিয়া যায়।

জুম চাষের এই সামাজিক কুফলের কথা আলোচনা প্রসঙ্গে না হয় বাদই দেওয়া হইল। বৎসরের পর বৎসর বেপরোয়াভাবে অরণ্য-সম্পদ বিনাশের ফল কী তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। মূল্যবান বৃক্ষাদির ধ্বংসসাধনের ফলে রাজ্যের আর্থিক ক্ষতি হয়। এই ক্ষতিও গৌণ—ইহা অপেক্ষাও গুরুতর ক্ষতি আছে। তাহা এই ঃ গাছ-পালার ধ্বংসসাধনের ফলে পাহাড়গুলি বৃষ্টিব জল ধরিয়া রাখার ক্ষমতা হারাইয়া ফেলে। বৃষ্টির জল পাহাড়ের গাত্রস্থ মাটি ধৌত করিয়া আনিয়া নদীগুলিকে ক্রমশঃ বুজাইয়া দেয়। বর্ষাকালে অত্যধিক বারিপাতের সময় যে বিপুল জলরাশি ছুটিয়া নিচে নামিয়া আসে তাহা ধারণ করার শক্তি এই অগভীর নদীগুলির থাকে না। আসে বন্যা। বন্যার পর আসে মহামারী। সমাজ-জীবনে বিপর্যয় নামিয়া আসে। গ্রামে-শহরে হাহাকার উঠে।

কৃষি-অর্থনীতির দিক হইতেও জুম-প্রথা ক্ষতিকর। যে-কালে পৃথিবীর অন্যান্য দেশ কৃষিকার্যে নূতন নূতন যান্ত্রিক উপায়-উপকরণ উদ্ভাবন করিতেছে, ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যেও

যখন ট্রাক্টর ইত্যাদি বিজ্ঞান-সৃষ্ট যন্ত্রপাতি ব্যবহারের চেষ্টা চলিতেছে তখন আদিবাসিগণ জুমচাষের মত এক আদিম প্রথা আঁকড়াইয়া থাকিতে পারে না। এই আদিম চাষ-পদ্ধতি অবলম্বনের ফলে জমির উৎপাদন-শক্তির যে বিপুল অপচয় ঘটিতেছে, নিচের হিসাবটি পরীক্ষা করিয়া দেখিলে তাহা জানা যাইবে :—

| ফসল | জমিব পবিমাণ (একর হিসাবে) | | উৎপাদনেব পবিমাণ | |
|---|---|---|---|---|
| | ১৯৫২-৫৩ | ১৯৫৩-৫৪ | ১৯৫২-৫৩ | ১৯৫৩-৫৪ |
| আউশ | ৭৩১৫৩ | ৬৯৯৯০২ | ৭৩৩৪৫৫ | ৭৫৫৪০৯ |
| আমন | ২১১১৮১ | ২২১১২৯ | ২৬১২৬৮৪ | ২[illegible]৬৯২৫৪ |
| জুম | ৫৭৮৪৫ | ৫৭২৮৯ | ৩৮১৮১৯ | ৩৮৯৮৪৬ |
| বোরো | ৪০১৪ | ৪৫২১ | ৩৬১৩৭ | ৪২৮৩২ |

জুম চাষের উপর কৃষিজীবী জনসমষ্টির এক উল্লেখযোগ্য অংশের নির্ভরশীলতা কৃষিক্ষেত্রে ত্রিপুরার পশ্চাৎপদতার অন্যতম প্রধান লক্ষণ সন্দেহ নাই।

পদ্ধতি ও উপকরণের দিক হইতে সমতল অঞ্চলের চাষ-আবাদের অবস্থাও শোচনীয়। কৃষিকার্যে ট্রাক্টর ইত্যাদি উন্নততর যন্ত্রপাতি-ব্যবহারের দিক হইতে ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় ত্রিপুরার স্থান একেবারে শেষের দিকে। এই সম্পর্কে ১৯৫১ সালের Indian livestock censusএর ভিত্তিতে রচিত বিশ্বভারতী কর্তৃক প্রকাশিত

এক সাম্প্রতিক পুস্তিকায় পূর্ব-ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের যে-চিত্র দেওয়া হইয়াছে তাহা এইরূপ :—

| রাজ্য | ট্রাক্টর | প্রতি ১০,০০০ কৃষিজীবীর মধ্যে ট্রাক্টরের সংখ্যা |
|---|---|---|
| আসাম | ২০৬ | ০'৩ |
| পশ্চিমবঙ্গ | ২২৩ | ০'২ |
| বিহার | ৫০৬ | ০'১ |
| উড়িষ্যা | ৫৯ | ০'০৫ |
| মণিপুর | ৭ | ০'১ |
| ত্রিপুরা | ২ | ০'০৪ |

পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিকে একত্রে ধরিলে প্রতি ১০,০০০ কৃষি-জীবীর মধ্যে ব্যবহৃত ট্রাক্টরের সংখ্যা ০'১—অর্থাৎ ত্রিপুরার আড়াই গুণ। সমস্ত ভারতবর্ষের কথা বিচার করিলে প্রতি ১০,০০০ কৃষিজীবী ০'৩টি ট্রাক্টর ব্যবহার করে। এই সংখ্যা ত্রিপুরার প্রায় আট গুণ।

আধুনিক যন্ত্রপাতির কথা ছাড়িয়া দিয়া সাধারণ কাঠের লাঙ্গলের হিসাব দেওয়া যাক। আশ্চর্যের কথা, যে-রাজ্যে বারআনা লোকই কৃষিজীবী, যেখানে প্রধানতঃ কৃষিকে আশ্রয় করিয়া সমস্ত সমাজ-ব্যবস্থা দাঁড়াইয়া আছে, সেখানে প্রতি দশ হাজার কৃষকের মধ্যে লাঙ্গলের সংখ্যা মাত্র ৯০৫টি। এই দিক দিয়া ত্রিপুরা রাজ্য পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলির তুলনায় কতখানি পশ্চাৎপদ, পর-পৃষ্ঠায় প্রদর্শিত তথ্যগুলি পাঠ করিলে তাহা বুঝা যাইবে :—

| রাজ্য | প্রতি ১০,০০০ কৃষিজীবীর মধ্যে লাঙ্গলের সংখ্যা |
|---|---|
| আসাম | ১৬০৯ |
| পশ্চিমবঙ্গ | ১৫০৯ |
| বিহার | ৬৯৯ |
| উড়িষ্যা | ১৬৮২ |
| মণিপুর | ১০৬০ |
| ত্রিপুরা | ৯০৫ |

আর সেচ-ব্যবস্থা? ত্রিপুরা প্রশাসন কর্তৃক ১৯৫৫ সালে প্রকাশিত এক পুস্তিকায় এই রাজ্যে সেচ-ব্যবস্থার অস্তিত্ব প্রায় নাই বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। প্রমাণ-স্বরূপ দেখান হইয়াছে যে, প্রতি বৎসর প্রায় একশত ইঞ্চি বারিপাত হইলেও ত্রিপুরায় রবি-শস্যের উৎপাদন প্রায় হয় না বলা চলে (Irrigation facilities are almost wholly absent which is symptomatised by the fact that although there is about 100 inches rainfall on the average per year, there is practically no *roby* cultivation in the state.)। পরিকল্পনা কমিশনও ত্রিপুরায় সেচ-ব্যবস্থার অস্তিত্বের কথা উল্লেখ করেন নাই।

এই অবস্থায় ফল যাহা হইবার তাহাই হইয়াছে। ১৯৫১-৫২ সালে পশ্চিম বাংলায় একরপ্রতি ধান্য উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৮২১ পাউণ্ড। সেই সময় ত্রিপুরায় উৎপাদনের হার ছিল ৭৮৭

পাউণ্ড। ঐ বৎসর পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরার অন্যান্য ফসলের একর-প্রতি উৎপাদনের পরিমাণ নিচে দেওয়া হইল ঃ

(পাউণ্ড হিসাবে)

| | আলু | পাট | ইক্ষু | লঙ্কা | তিল |
|---|---|---|---|---|---|
| পশ্চিমবঙ্গ ঃ | ৯৫২০ | ১০৬৪ | ৩৯৯৩ | ১৪০০ | ৪৮০ |
| ত্রিপুরা ঃ | ৩৩৬০ | ৯৭৬ | ৩১৩৬ | ৪৮৮ | ২২৪ |

এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখিতে হইবে, পশ্চিম বাংলার তুলনায় ত্রিপুরার জমিগুলি "নূতন আবাদী"। ত্রিপুরার মাটির বুকে ভরা-যৌবনের প্রাণ-প্রাচুর্য লুকাইয়া রহিয়াছে। কৃষি-বিজ্ঞানের ভাষায় ইহারই নাম উর্বরাশক্তি। এই উর্বরাশক্তিকে পরিপূর্ণভাবে কাজে লাগাইতে হইবে। বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও মানুষের কর্মশক্তির সংযোগে এই মাটিতে সোনা ফলিবে। সমৃদ্ধির পথে ইহাই হইবে ত্রিপুরার প্রথম বলিষ্ঠ পদক্ষেপ।

**বাণিজ্য**

কথায় বলে, বাণিজ্যে লক্ষ্মীর বসতি। প্রাচীন ইতিহাস-আলোচনা-প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, ত্রিপুরা রাজ্য এক কালে সমুদ্রোপকূল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। উইলফ্রেড্ স্কফ্ কর্তৃক সম্পাদিত 'Periplus of the Erythrean Sea' গ্রন্থে গ্রীক-নাবিকদের ভ্রমণবৃত্তান্ত-পাঠে গঙ্গানদীর মোহনা হইতে পূর্বদিকে ষাট মাইল দূরে ত্রিপুরা দেশের অস্তিত্বের কথা জানা যায়। ষোড়শ শতাব্দীর একেবারে প্রথম দিকে ইতালীয় ভ্রমণকারী বার্থেমা সিংহল হইতে ব্রহ্মদেশ গমন করেন। তথা হইতে প্রত্যাবর্তনকালে তিনি "বাঙ্গালা নগরীতে" অবতরণ করেন। এই নগরীর স্থান নির্দেশ

করিয়া বার্থেমা বলিয়াছেন যে, ইহা মেঘনা নদীর বাম-তীরে ত্রিপুরায় অবস্থিত ছিল। কেহ কেহ অধুনা-লুপ্ত শ্রীপুরকেই "বাঙ্গালা নগরী" বলিয়া ধারণা করিয়াছেন। এই শ্রীপুর বর্তমান রাজবাড়ীর চারি মাইল দক্ষিণে এবং সোনারগাঁও হইতে প্রায় চারি মাইল দূরে অবস্থিত ছিল। পদ্মানদীর গতি-পরিবর্তনের ফলে ইহা কালক্রমে নদীগর্ভে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। এই শ্রীপুরকেই বার্থেমা-বর্ণিত "বাঙ্গালা নগরী" বলিয়া নিঃসংশয়ে স্বীকার করার উপায় নাই। কারণ, বার্থেমা বলিয়াছেন, উক্ত নগরী ত্রিপুরায় অবস্থিত ছিল। শ্রীপুর কোনকালে ত্রিপুরা রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল, এই সিদ্ধান্তের স্বপক্ষে নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায় না।

রালফ্ ফিচ্ শ্রীপুর হইতে জলপথে পেগু অভিমুখে যাত্রা করেন। এই অভিযান-প্রসঙ্গে তিনি যে বর্ণনা দিয়াছেন, তাহা এই : "১৫৮৬ সালের ২৮শে নভেম্বর আলবার্ট কারাভালোস নামক জনৈক ব্যক্তির একটি ক্ষুদ্র তরী আশ্রয় করিয়া আমি পেগু রওয়ানা হই। গঙ্গানদী বাহিয়া আমি একে একে সন্দ্বীপ, Port Grande অথবা ত্রিপুরা দেশ এবং মগরাজ্য অতিক্রম করিয়া যাই।"

লক্ষ্য করার বিষয়, রালফ্ ফিচ্ ত্রিপুরাকে Port Grande নামে উল্লেখ করিয়াছেন। Port Grande এবং আধুনিক চট্টগ্রাম অভিন্ন। পর্তুগীজগণ চট্টগ্রামকে এই নামে অভিহিত করিত। এক কালে চট্টগ্রাম ত্রিপুরার অন্তর্ভুক্ত ছিল, ইহা ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে।

উপরোক্ত বিবরণসমূহ হইতে ত্রিপুরা রাজ্যে এক সমৃদ্ধ বন্দরের অস্তিত্বের কথা জানা যায়। এই বন্দর যে বাণিজ্য-কার্যে

ব্যবহৃত হইত, ইহা বলাই বাহুল্য। মুসলমান আমলে ঢাকার সঙ্গে ত্রিপুরার বাণিজ্যের প্রমাণ পাওয়া যায়। টেভের্নিয়ারের ভ্রমণ-বৃত্তান্তে ত্রিপুরায় স্বর্ণ-খনির উল্লেখ রহিয়াছে। তিনি ১৬৬৬ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকা গিয়াছিলেন। Periplus গ্রন্থেও ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্য দিয়া ভারতবর্ষে স্বর্ণ আমদানির কথা বলা হইয়াছে। এই স্বর্ণ-সম্পদ আসাম ও ব্রহ্মদেশের নদী বাহিয়া ত্রিপুরায় আসিত। শ্রীনীহার রায়ের "বাঙালীর ইতিহাসে" লিখিত আছে: "ত্রিপুরার যে সব বণিক ঢাকায় বাণিজ্য করিতে আসিতেন তাঁহারা টুকরা টুকরা সোনার পরিবর্তে লইয়া যাইতেন প্রবাল, অয়স্কান্ত মণি, কূর্মাবরণের এবং সামুদ্রিক শঙ্খের বালা।" টেভের্নিয়ারের মতে ত্রিপুরার স্বর্ণ খুব উৎকৃষ্ট শ্রেণীর ছিল না।

প্রসঙ্গতঃ শ্রীনীহার রায় আরও একটি তথ্য পরিবেশন করিয়াছেন: "কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের টীকাকার বাংলা দেশের একটি আকরজ দ্রব্যের খবর দিতেছেন। কৌটিল্য যে অধ্যায়ে মণিরত্নের খবর বলিতেছেন, সেই অধ্যায়ে হীরামণির উল্লেখ আছে। টীকাকার এই হীরামণির খনি কোথায় ছিল, তাহার একটি নাতিদীর্ঘ তালিকা দিয়াছেন; এই তালিকায় দুইটি জনপদ নিঃসন্দেহে বাংলা দেশ; তাহাদের নাম, টীকাকারের ভাষায়—পৌণ্ড্রক এবং ত্রিপুর।"

স্বর্ণ ব্যতীত টেভের্নিয়ারের বিবরণীতে ত্রিপুরায় রেশম শিল্পের উল্লেখ পাওয়া যায়। ত্রিপুরায় উৎপন্ন রেশমের চাহিদা চীনদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল বলিয়া টেভের্নিয়ার লিখিয়া গিয়াছেন।

প্রসঙ্গতঃ হাতীর দাঁতের নানাবিধ শৌখিন দ্রব্যের কথা উল্লেখযোগ্য। রালফ্ ফিচ্ বাকোলা হইতে শ্রীপুর গমন করেন।

বাকলা আধুনিক বরিশালের প্রাচীন নাম। ফিচ্-এর ভ্রমণ-বিবরণীতে তথাকার জনসাধারণের জীবনযাত্রার একটি চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। চিত্রটি সংক্ষিপ্ত হইলেও সুন্দর। ইহা পাঠে জানা যায় যে, তৎকালে ঐ অঞ্চলের রমণীদের মধ্যে হাতীর দাঁতের অলংকারের বহুল প্রচলন ছিল। এই অলংকারাদি যে ত্রিপুরা হইতেই চালান যাইত তাহা সহজেই অনুমান করা যায়।

* * * *

অতীত ঐশ্বর্যের স্মৃতি-মন্থন করিয়া লাভ নাই। কালের প্রয়াণ-পথে সেকালের সম্পদরাশিও বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। ইতিহাসের গতিধারায় ত্রিপুরার মানচিত্রে অনেক পরিবর্তন ঘটিয়াছে। এক-কালের সমুদ্র-সান্নিধ্য হারাইয়া ইংরেজ আমলে ইহার নাম হইয়াছে "পার্বত্য ত্রিপুরা"। দেশবিভাগের পর রাজ্যের আয়তনই শুধু সংকুচিত হয় নাই—স্থলপথে বহির্গমনের দুয়ারও প্রায় রুদ্ধ হইয়াছে। এই সঙ্গে রুদ্ধ হইয়াছে ব্যবসা-বাণিজ্যের পথও।

* * * *

ইংরেজ আমলে কার্পাস, তিল ইত্যাদি কৃষিজাত দ্রব্য এবং বাঁশ, বেত, ছন ও জ্বালানী কাঠ প্রচুর পরিমাণে রাজ্যের বাহিরে চালান যাইত। ইহা হইতে প্রতি বৎসর যে আয় হইত, রাজ্যের মোট বাৎসরিক আয়ের তুলনায় তাহা নগণ্য ছিল না। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বলা যায় যে, ১৮৭৪-৭৫ সালে রাজ্যের মোট আয় ছিল ১৮,৬৯৩ পাউণ্ড। তন্মধ্যে কার্পাস ও তিল রপ্তানি-শুল্ক হিসাবে আদায় হইয়াছিল ৪,৭১৮ পাউণ্ড। ১৮৭২ সালে ৭,৫০০ পাউণ্ড মূল্যের কাঠ বাহিরে চালান গিয়াছিল। ১৮৭২ হইতে ১৮৭৫ সাল পর্যন্ত যে-পরিমাণ

কার্পাস ও তিল রপ্তানি হইয়াছিল নিচে তাহার হিসাব দেওয়া হইল :—

( মণ হিসাবে )

| | ১৮৭২-৭৩ | ১৮৭৩-৭৪ | ১৮৭৪-৭৫ |
|---|---|---|---|
| কার্পাস : | ৫৪০০০ | ৪০৫১১ | ৩৫০৪৩ |
| তিল : | × | ১২৫৪১ | ১১৩৯৫ |

•১৮৮১-৮২ সালে ১,৬০০ টন কার্পাস বাহিরে প্রেরিত হইয়াছিল।

দেশবিভাগের পূর্বে ত্রিপুরার বহির্বাণিজ্য সম্পর্কে সর্বশেষ তথ্য ১৯৪৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে প্রকাশিত ১৯৪৩-৪৬এর প্রশাসনিক বিবরণীতে (Administrative Report) পাওয়া যায়। তথ্যগুলি নিম্নরূপ :—

| | ১৯৪২-৪৩ | ১৯৪৩-৪৪ | ১৯৪৪-৪৫ | ১৯৪৫-৪৬ |
|---|---|---|---|---|
| কার্পাস : | ৭২৫০ মণ | ৬৩৭৪ মণ | ২৩৫০ মণ | ২১১৮ মণ |
| তিল : | ২০৭৪৭ ,, | ২৩৫৮৫ ,, | ৫৪৯১৯ ,, | ৫৯৪০০ ,, |
| সরিষা : | ৩৯৩৫৮ ,, | ২২৯৬২ ,, | ২৬৪৭২ ,, | ২৭৯৬২ ,, |
| পাট : | ৪৬০০৫৮ ,, | ১০০৭১৬ ,, | ৬৫৩৪৭ ,, | ১৮১৩৫২ ,, |
| ধান-চাউল : | ৩৬০৮০০ ,, | ৪৭৩১৮ ,, | ২০৯৮৮১ ,, | ৩৫২১৫৭ ,, |
| চা : | ৩৩২৭৪২৩ পাঃ | ২৭৯৩৩·৬ পাঃ | ২৬৩২৩৬০ পাঃ | ২ ৫১৩৩৬ পাঃ |

১৯৪৫-৪৬ সালে রাজ্যের মোট আয় ছিল ৪০,৬৩,৭৮২ অর্থাৎ প্রায় সাড়ে চল্লিশ লক্ষ টাকা। তন্মধ্যে স্থল ও জলপথে রপ্তানীকৃত বনজ দ্রব্যাদি হইতে শুল্ক বাবদ আয় হইয়াছিল ১০,৩০,৮৯৪ টাকা; বলা বাহুল্য, এই আয় সামান্য নয়।

দেশবিভাগের ফলে ত্রিপুরার বহির্বাণিজ্য প্রভূত পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। বাঁশ, বেত, ছন ইত্যাদি বনজ দ্রব্যাদির রপ্তানি একেবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। পাট, চা ইত্যাদি রপ্তানিযোগ্য পণ্য যাতায়াতের অসুবিধা এবং অত্যধিক ব্যয়ের জন্য বাহিবের বাজাবে তেমন সুবিধা করিয়া উঠিতে পারিতেছে না।

ত্রিপুরা রাজ্যে প্রচুব পরিমাণে আনারস ও কমলালেবু উৎপন্ন হয়। দেশবিভাগের ফলে ইহাদের বাজার নষ্ট হইয়া গিয়াছে। বিমানপথে চড়া মাশুল দিয়া কলিকাতা চালান দেওয়া লাভজনক নয়। ফলে প্রতি বৎসর বিরাটপরিমাণ ফসলেব অপচয় ঘটিতেছে। সম্প্রতি সরকার বৈজ্ঞানিক উপায়ে রস সংগ্রহ ও ফল সংরক্ষণ করিয়া রাজ্যের বাহিরে বিক্রয়ার্থে প্রেবণ করিতেছেন।

**শিল্প**

শিল্পক্ষেত্রে ত্রিপুবাব অনগ্রসরতার কথা ইতিপূর্বে বলা হইয়াছে। কাঁচা মালেব প্রাচুর্য সত্ত্বেও এই রাজ্যে আধুনিক কলকারখানা গড়িয়া উঠাব সুযোগ পায় নাই। শিল্প বলিতে একমাত্র চা-শিল্পের উল্লেখই করা যায়। বিভিন্ন ধরনের কুটির-শিল্প নানা প্রতিকূলতার মধ্যে কোন প্রকারে টিকিয়া আছে। ইহাদের অবস্থা নিতান্ত দুর্দশাগ্রস্ত। কৃষির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এই মৃতপ্রায় কুটির-শিল্পকে বাঁচাইয়া না তুলিতে পারিলে ত্রিপুরায় মানুষের আর্থিক উন্নতি সাধিত হইবে না, এই কথা একবাক্যে সকলেই স্বীকার করেন।

অতীতে রাজ্যের অধিবাসীদের মধ্যে হস্তচালিত তাঁতশিল্পের খুব প্রসার ছিল। এই সকল ঘরে-তৈয়ারী কাপড় রাজ্যবাসীদের এক

উল্লেখযোগ্য অংশের চাহিদা মিটাইত। ত্রিপুর-রমণীদের হাতে-প্রস্তুত 'রিয়া' শিল্প-কর্মের এক অপূর্ব নিদর্শন হিসাবে রাজ্যের বাহিরেও আদৃত হইত।

১৯২১ সালের সেন্সাস বিবরণী হইতে মোট ৩৩,৮৫৬টি আদিবাসী পরিবারের মধ্যে ৩১,৫৮৫টি তাঁতের অস্তিত্বের কথা জানা যায়। ১৯৩১ সালের গণনা অনুসারে ঐ বৎসর পুরাতন ত্রিপুরাদের মধ্যে তাঁত ও চরকার সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১৫,৪০৮ ও ১৫,২৯৬। উক্ত হিসাবে আদিবাসীদের অন্যান্য অংশেও তাঁতশিল্পের বহুল প্রচলনের উল্লেখ রহিয়াছে। এই স্থলে বলিয়া রাখা প্রয়োজন যে, তাঁতের কাজে আদিবাসী নারীদের একচেটিয়া অধিকার। পুরুষরা এই কাজে তেমন কোন অংশ গ্রহণ করে না। নিচে বিভিন্ন গোষ্ঠীভুক্ত আদিবাসী স্ত্রীলোকদের সংখ্যার অনুপাতে তাঁত ও চরকার একটি হিসাব দেওয়া হইল :—

| গোষ্ঠীর নাম | স্ত্রীলোকের সংখ্যা | তাঁত | চরকা |
|---|---|---|---|
| জমাতিয়া | ৫২৫৬ | ২৪৩৪ | ২২৮০ |
| নোয়াতিয়া | ১৩২৫১ | ৫৬৪০ | ৫৯৬৬ |
| রিয়াং | ১৭৪৮২ | ৮৩৯১ | ৮০২৩ |

কালক্রমে এই কুটির-শিল্পের অবনতি ঘটিয়াছে। সমতল অঞ্চলের মানুষদের সংস্পর্শে আসিয়া আদিবাসীদের রুচি ও চাহিদার অনেক পরিবর্তন হইয়াছে। তাঁতে প্রস্তুত মোটা 'পাছড়া' ইত্যাদির স্থান লইয়াছে মিলের বাহারে শাড়ি ও ধুতি। ইহা ছাড়া তাঁতশিল্পের অবনতির অন্যান্য কারণও আছে। আজ আর পাহাড়ে পাহাড়ে

আদিবাসীদের পাড়ায় পাড়ায় পূর্বের মত চরকার গুঞ্জন শোনা যায় না, শোনা যায় না তাঁতের মিষ্টি আওয়াজ। ১৯৫১ সালের হিসাব অনুসারে প্রায় দেড়লক্ষ পরিবারের মধ্যে তাঁতের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে মাত্র ২৯৬৪৮।

অন্যান্য কুটির-শিল্পের মধ্যে গুড় ও তেলের ঘানির এবং ছাতার বাঁটের নাম উল্লেখযোগ্য। ত্রিপুরায় প্রচুর পরিমাণে ইক্ষু ও বিভিন্ন ধরনের তৈলবীজ উৎপন্ন হয়। ১৯৫৬ সালের মার্চ মাসের এক হিসাব হইতে জানা যায় যে, ১৯৫৪-৫৫ সালে ছয় হাজার একর পরিমাণ জমিতে দশহাজার টন, অর্থাৎ প্রতি একরে ২২৪০ পাউণ্ড ইক্ষু উৎপন্ন হইয়াছে। একর প্রতি ফলনের হার পশ্চিম বাংলার প্রায় অর্ধেক হইলেও আসামের তুলনায় বেশী।

উপযুক্ত ব্যবস্থা-অবলম্বনপূর্বক ইক্ষুচাষের প্রভূত প্রসার-সাধনের সুযোগ রহিয়াছে। ত্রিপুরায় চিনি-কলের সম্ভাবনা সম্পর্কে অনেকে আশা পোষণ করিয়া থাকেন। ইহা অবশ্য বিশেষজ্ঞদের বিচাবসাপেক্ষ। তবে গুড় প্রস্তুতের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কেন্দ্র স্থাপন করিয়া ইক্ষু-সম্পদেব সদ্ব্যবহাবেব পথ রহিয়াছে। সুষ্ঠু পবিকল্পনা-অনুযায়ী এই কাজে এখনই হাত দেওয়া সম্ভব। ইক্ষু হইতে রসসংগ্রহের যে ব্যবস্থা বর্তমানে রহিয়াছে তাহা অতি সামান্য। ১৯৫১ সালের Indian livestock census হইতে যে তথ্য উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে তাহা পাঠ করিলে জানা যায় যে, উন্নত ধরনের যন্ত্র-চালিত ইক্ষু-পেষাই কোন ব্যবস্থা ত্রিপুরায় একেবারেই নাই। থাকিবার মধ্যে মান্ধাতার আমলের ৯৯১টি পশু-টানা পেষাই-কলই মাত্র আছে।

১৯৫৪-৫৫ সালে মোট কুড়ি হাজার একর জমিতে বিভিন্নজাতীয় যে তৈলবীজ উৎপন্ন হইয়াছে তাহার পরিমাণ তিন হাজার টন। তন্মধ্যে সরিষার পরিমাণ দুই হাজার টন। তৈল-প্রস্তুতের ঘানি রহিয়াছে মোট ৫০৩ টি।

ত্রিপুরায় প্রচুরপরিমাণ বাঁশ উৎপন্ন হয়। এই সকল বাঁশ হইতে উৎকৃষ্ট ছাতার বাঁট প্রস্তুত হইতে পারে। ইদানীং সরকার এই শিল্পের উন্নতির প্রতি মনোযোগী হইয়াছেন। ইহা ছাড়া ত্রিপুরায় বেতের আসবাবপত্র প্রস্তুতের প্রভূত সুযোগ রহিয়াছে। এই দিকে উপযুক্ত দৃষ্টি দিলে সুফল পাওয়া যাইবে।

**চা-শিল্প**

১৯১৬ সালে কৈলাসহর বিভাগস্থ হীরাছড়া বাগান প্রতিষ্ঠিত হয়। ত্রিপুরায় ইহাই প্রথম চা-বাগান। ১৯৩১ সালে চা-বাগানের মোট সংখ্যা ছিল ৫০। নিচের হিসাব হইতে এই রাজ্যে চা-শিল্পের ক্রমোন্নতির চিত্র পাওয়া যাইবে :—

| বৎসর | মোট উৎপাদন |
|---|---|
| ১৯২৩ | ২,২৫,৫৩৩ পাউণ্ড |
| ১৯২৪ | ৩,৩৮,২৭২ ,, |
| ১৯২৫ | ৫,৬০,৫৬৮ ,, |
| ১৯২৬ | ৮,২০,৬১৫ ,, |
| ১৯২৭ | ৯,৪০,০৬২ ,, |
| ১৯২৮ | ১০,৫৭,৪০৮ ,, |
| ১৯২৯ | ১৪,০২,৭২৮ ,, |
| ১৯৩০ | ১২,৪৯,৩৭৪ ,, |

চা-শিল্প সম্পর্কে সর্বাধুনিক তথ্য যাহা পাওয়া যায় তাহা এইরূপ :—

| বাগানের সংখ্যা | মোট আবাদ কৃত এলাকা | বাগানগুলির অধিকারভুক্ত মোট জমি | উৎপাদন |
|---|---|---|---|
| ৪৯ | ১০২৫৮ একর | ২৩৯৩০ একর | ৩০৪৮০০০ পাউণ্ড |

এই হিসাবটি ভারত সরকারের খাদ্য ও কৃষি মন্ত্রণালয়ের অর্থনৈতিক ও পরিসংখ্যান উপদেষ্টা কর্তৃক প্রচারিত Tea in India, 1952 পুস্তিকা হইতে গৃহীত। ৪৯টি বাগানে দৈনিক গড়-হিসাবে শ্রমিক সংখ্যা ৬২৪৭ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে বাগানে বসবাসকারী স্থায়ী শ্রমিকের সংখ্যা ৫৩২৬; বাহিরের স্থায়ী ও অস্থায়ী শ্রমিকের সংখ্যা যথাক্রমে ৪০১ এবং ৫২০। ত্রিপুরা প্রশাসন কর্তৃক ১৯৫৫ সালে প্রকাশিত এক পুস্তিকায় ১৯৫৩ সালে ত্রিপুরার মোট বাগানের সংখ্যা ৫৫ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে ২৬টি সদর বিভাগে, ১২টি কৈলাসহরে, ৭টি ধর্মনগরে, ৬টি কমলপুরে এবং ২টি করিয়া খোয়াই ও সাব্রুম বিভাগে অবস্থিত। এই হিসাব অনুসারে ১৯৫৩ সালের জুলাই মাসে শ্রমিক-সহ সর্বশ্রেণীর কর্মচারীর সংখ্যা ছিল ৬,২৬৯। তন্মধ্যে শ্রমিকের সংখ্যা ৬০৪২।

১৯৪২-৪৩ সাল হইতে ১৯৪৫-৪৬ সাল পর্যন্ত চা হইতে শুল্ক বাবদ রাজ্যের যে পরিমাণ আয় হইয়াছিল তাহার বিবরণ নিম্নরূপ :—

| | | |
|---|---|---|
| ১৯৪২-৪৩ | ... | ৬৭ ৪৩৭ টাকা |
| ১৯৪৩-৪৪ | ... | ৬০ ৭৬০ ” |
| ১৯৪৪-৪৫ | ... | ৩৩ ৫১৫ ” |
| ১৯৪৫-৪৬ | ... | ৫৬ ৪৭১ ” |

পূর্বেই বলা হইয়াছে, ত্রিপুরায় কোন কলকারখানা নাই। 'মহারাজা ম্যাচ ফ্যাক্টরি' নামে একটি দিয়াশলাই কারখানা আগরতলা শহরের সন্নিকটে স্থাপিত হইয়াছিল। এই কারখানায় ১৯৪৩-৪৪ ও ১৯৪৪-৪৫ সালে যথাক্রমে ৩৩১২ এবং ২৭৫৬ গ্রোস দিয়াশলাই উৎপন্ন হয়।

বহু বৎসর ধরিয়া এই রাজ্যে খনিজ সম্পদ আবিষ্কারের চেষ্টা চলিয়া আসিতেছে। ১৯১৬ সালে মিঃ ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ ও মিঃ লেপার নামক বার্মা অয়েল কোম্পানির দুইজন ইঞ্জিনিয়ার তৈল-খনির অনুসন্ধান উদ্দেশ্যে ত্রিপুরায় আসিয়াছিলেন। কয়েক বৎসর পূর্বে উক্ত অয়েল কোম্পানির পক্ষ হইতে পুনরায় অনুসন্ধান-কার্য চালান হয়। ফলাফল অবশ্য জানা যায় নাই। ১৯৫৪ সালে একটি রুশ বিশেষজ্ঞদলও এই উদ্দেশ্যে আসিয়াছিলেন।

আধুনিক কলকারখানা গড়িয়া তোলার জন্য কাঁচামালের অস্তিত্বই যথেষ্ট নয়। ইহার জন্য প্রথমতঃ চাই বিদ্যুৎ, তৈল ও কয়লা — প্রয়োজন সুষ্ঠু যোগাযোগ-ব্যবস্থার। এই উভয় দিকেই ত্রিপুরা অনগ্রসর। সুখের কথা, পর্বতাভ্যন্তরে ইদানীং কয়লা আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই কয়লার গুণাগুণ ও পরিমাণ সম্পর্কে এখন পর্যন্ত নিশ্চিত কিছুই জানা যায় নাই। গোমতী ও খোয়াই নদীর উৎস-স্থলে বিদ্যুৎ-উৎপাদনকেন্দ্র স্থাপনের উদ্দেশ্যে প্রাথমিক অনুসন্ধান-কার্যও সুরু হইয়াছে। এই প্রচেষ্টা সফল হইলে শিল্পক্ষেত্রে ত্রিপুরার উন্নতির সুযোগ ঘটিবে এবং রাজ্যবাসীদের সুখ ও সমৃদ্ধির দুয়ার খুলিয়া যাইবে।

# অষ্টম অধ্যায়

## আয়-ব্যয়ের খতিয়ান

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আর্থিক ক্ষেত্রে ত্রিপুরার দুর্বলতার মূল লক্ষণ-গুলি আলোচনা করা হইয়াছে। ' এইবার জনসাধারণের আয়-ব্যয়ের মোটামুটি পরিচয় লওয়া যাক।

প্রথমেই বলিয়া রাখা প্রয়োজন যে, যে-প্রসঙ্গের অবতারণা করা হইতেছে, সেই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করিবার উপায় নাই। কারণ, এই সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায় না। যুগ-পরম্পরায় ত্রিপুবাবাসীদের দৈনন্দিন জীবন-যাত্রার ধারাবাহিক হিসাব লওয়া ত একেবারেই দুঃসাধ্য। 'রাজমালা' রাজাদের কীর্তি-কাহিনী। এই কাহিনীতে সাধারণ মানুষের উল্লেখ নিতান্ত গৌণ। ত্রিপুরার অতীত্ ঐতিহাসিকগণও নিম্নস্তরের রাজ্যবাসীর জীবন সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধানের তেমন আগ্রহ প্রদর্শন করেন নাই। ইংরেজ লেখকদের রচনায় তবু কিছু কিছু আলোকপাতের চেষ্টা হইয়াছে। কিন্তু তাহাও এমন ধরনের যে, খণ্ড খণ্ড চিত্র এক সূত্রে গাঁথিয়া সমগ্র অবস্থার পূর্ণ পরিচয় পাওয়া দুষ্কর।

বর্তমান যুগ সম্পর্কে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে অতীতের দিকে একবার দৃষ্টি দেওয়া যাক। গ্রাম ও শহরে বয়োবৃদ্ধদের মুখে শোনা যায়, এককালে জিনিসপত্রের নাকি জলের দাম ছিল। জলের দাম বলিতে তাঁহাদের নিকট হইতে যে হিসাব পাওয়া যায়, তাহা শুনিয়া অভাব-অনটন-পীড়িত বর্তমান কালের গৃহস্থ মানুষের মনে ঈর্ষা হওয়া স্বাভাবিক। অতীতের সচ্ছল দিনগুলির কথা

ভাবিয়া, ছায়া-ঢাকা পাখী-ডাকা মায়া-ঘেরা গ্রাম্য-জীবনের কথা স্মরণ করিয়া বয়োজ্যেষ্ঠরা আজও দীর্ঘশ্বাস ফেলেন।

ত্রিপুরা রাজ্যে দৈনন্দিন ব্যবহার্য দ্রব্যাদি একদা কীরূপ সুলভ ছিল কাগজপত্রে তাহার কিছু কিছু উল্লেখ পাওয়া যায়। মধ্যযুগের ইতিহাস আলোচনা-প্রসঙ্গে সমসের গাজীর নাম উল্লেখ করা হইয়াছে। এই সমসেব গাজী ত্রিপুবার রাজত্ব-অধিকারপূর্বক এক আদেশনামা দ্বারা রাজ্যমধ্যে নিত্যব্যবহার্য জিনিসপত্রের মূল্য ধার্য করিয়া দিয়াছিলেন। এই আদেশনামা বর্তমান কালের মূল্যনিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থার অনুরূপ ছিল। আদেশ-ভুক্ত বিভিন্ন জিনিসের দাম ও সের-প্রতি মূল্য-তালিকা নিম্নরূপ ঃ

| | |
|---|---|
| চাউল | ৻৫ |
| লঙ্কা | ৻৫ |
| গুড় | ৻১০ |
| নুন | ৻১০ |
| পিঁয়াজ | ৻১০ |
| কার্পাস | /৫ |
| কলাই | ৻৫ |
| মসুরি | ৻১০ |
| মটর | ৻১০ |
| মুগ | /০ |
| অড়হর | /০ |
| সরিষার তৈল | ৶০ |
| ঘৃত | ।/০ |

সমসের গাজীর রাজত্বের এক শতাব্দী পরও অবস্থার বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় নাই। ১৮৭১-৭২ হইতে ১৮৮১-৮২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত দশ বছর সাধারণ শ্রেণীর চাউল মণ প্রতি প্রায় সোয়া তিন টাকা মূল্যে বিক্রয় হইত। ১৮৬৬ সালে রাজ্যমধ্যে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। কিন্তু তখনও চাউলের দাম মণ-প্রতি দশ টাকার উর্ধ্বে যায় নাই। গরু, মহিষ ইত্যাদি গৃহপালিত পশুর মূল্যও বর্তমানের তুলনায় অবিশ্বাস্য রকমে কম ছিল। উদাহরণস্বরূপ নিচের হিসাবটি উল্লেখ করা যায়ঃ

| | |
|---|---|
| গরু ১টি | ১২ টাকা |
| বলদ ১ জোড়া | ২৫ " |
| মহিষ ১ জোড়া | ৭৫ " |
| ভেড়া ২০টি | ২০ " |
| পাঁটা ২০টি | ৩০ " |
| শূকর ২০টি | ৮০ " |

সেই যুগে পাঁচ একর জমি আছে—এমন গৃহস্থকে সম্পন্ন বলা চলিত। চারি একর জমি সম্বৎসরের গ্রাসাচ্ছাদনের পক্ষে যথেষ্ট ছিল।

সেকালের সঙ্গে একালের ব্যবধান কত! স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম-অর্থ-নীতি বহুকাল বিদায় লইয়াছে। আদিবাসীদের মধ্যে বিনিময়-অর্থ-নীতির কিছু কিছু লক্ষণ এখনও চোখে পড়ে। কিন্তু তাহা আর বেশীদিন টিকিয়া থাকিতে পারিবে না। যুগ-যুগান্তব্যাপী রাজতন্ত্রের অচলায়তনের মধ্যে আবদ্ধ থাকার ফলে ত্রিপুরার জনসাধারণ বাঙলা প্রভৃতি ভারতবর্ষের অগ্রবর্তী রাজ্যবাসীদের সঙ্গে সমান তালে পা

মিলাইয়া চলিতে পারিল না। নূতন নূতন মানুষের আগমনের ফলে রাজ্যের জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাইল। একমাত্র কৃষিকে আশ্রয় করিয়া তাহারা বাঁচিতে চাহিল—অথচ কৃষিব্যবস্থা আদিম যুগে রহিয়া গেল। কুটিরশিল্প যাহা ছিল, তাহাও কালক্রমে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল। কোন বিকল্প অর্থনৈতিক বনিয়াদ গড়িয়া উঠার বিন্দুমাত্র লক্ষণ দেখা গেল না। আভ্যন্তরীণ যোগাযোগ-ব্যবস্থা কোন কালেই ছিল না—দেশবিভাগের পর বাহিরের সঙ্গে যোগসূত্রও ছিন্ন হইল। নিত্য-ব্যবহার্য জিনিসপত্র চড়া মাশুল দিয়া বিমানপথে আনা ছাড়া উপায় রহিল না। এই অবস্থায় সাধারণ রাজ্যবাসীর জীবন-যাত্রার মান কোথায় গিয়া দাঁড়াইবে, তাহা অনুমান করা সহজ।

### এযুগের ব্যালান্স-শিট

বর্তমানে ত্রিপুরার প্রতি একশত জন অধিবাসীর মধ্যে পঞ্চাশ জনই শ্রমজীবী। বর্তমান বলিতে ১৯৫১ সালের হিসাব ধরা হইতেছে। পশ্চিমবঙ্গ ও আসামে শ্রমজীবী মানুষের সংখ্যা যথাক্রমে শতকরা ৩৫ ও ৪৩। যেহেতু কৃষিই এই রাজ্যের বৃহত্তম জনসমষ্টির প্রধান জীবিকা, সেই হেতু শ্রমজীবীদের অধিকাংশই যে কৃষিকার্যে নিযুক্ত, ইহা বলাই বাহুল্য।

ভারত সরকারের শ্রম-মন্ত্রণালয়ের এক সাম্প্রতিক হিসাবে ত্রিপুরার কৃষক-পরিবারের গড়পড়তা বাৎসরিক আয় ৬৭৫ টাকা বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গে এই সংখ্যা ৬২২ টাকা। নিচে পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরায় ১৯৪৯-৫০ সালে বিভিন্নপ্রকার

কৃষিকার্যে নিযুক্ত পুরুষ, নারী ও শিশু শ্রমিকের দৈনিক মজুরির তুলনামূলক চিত্র দেওয়া হইল :

| | | হাল-চাষ | বাঁধেব কাজ | মই-দেওয়া |
|---|---|---|---|---|
| পঃ বঙ্গ | পুরুষ : | ১৶৮ পাই | ১॥৵১০ পাই | ১॥৴৩ পাই |
| | নারী : | × | × | × |
| | শিশু : | × | × | ১ টাঃ ৮ পাঃ |

| | | সার দেওয়া | বপন | প্রতিরোপণ |
|---|---|---|---|---|
| পঃ বঙ্গ | পুরুষ : | ১॥/৪ পাই | ১॥৵২ পাই | ১৶/১১ পাই |
| | নারী : | × | ১॥৵০ | ১॥/৩ পাই |
| | শিশু : | ১৵৬ পাই | ১ টাঃ ৪ পাঃ | ১৷৶১০ পাই |

| | | হাল চাষ | বাঁধের কাজ | মই-দেওয়া |
|---|---|---|---|---|
| ত্রিপুরা | পুরুষ : | ২/৭ পাই | ২/৭ পাই | ২/৭ পাই |
| | নারী : | × | × | × |
| | শিশু : | ১৶০ | × | × |

| | | সার দেওয়া | বপন | প্রতিরোপণ |
|---|---|---|---|---|
| ত্রিপুরা | পুরুষ : | ২/৭ পাই | ২৷৶২ পাই | ২॥৵৩ পাই |
| | নারী : | × | × | ২৲ |
| | শিশু : | × | × | ১৶০ |

| | | ফসল কাটা | মাড়াই |
|---|---|---|---|
| পঃ বঙ্গ | পুরুষ : | ১৶৵৪ পাই | ১৶/৪ পাই |
| | নারী : | ১৷৶০ | ১৷৶০ |
| | শিশু : | ১/৭ পাই | ১ টাকা ৪ পাই |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | পুরুষ : | ২৷৷/৭ পাই | •২০/০· |
| ত্রিপুরা | নারী : | ২ | × |
| | শিশু : | ১৸০ | × |

( প্রাক্তন রাজসরকার কর্তৃক প্রকাশিত সর্বশেষ প্রশাসনিক বিবরণী অনুসারে ১৯৭৩ হইতে ১৯৪৬ সালের মধ্যবর্তী সময়ে পুরুষ 'মুনি' ও 'ঘর-কামলার' দৈনিক মজুরির হার দুই টাকা হইতে আড়াই টাকার মধ্যে ছিল। নারী-শ্রমিকের 'রোজ' ছিল বার আনা হইতে দেড় টাকা; কর্মকার ও রাজমিস্ত্রীরা পাইত দুই টাকা হইতে তিন টাকা। )

আয়-ব্যয়ের সমতার উপর আর্থিক সচ্ছলতা নির্ভর করে, ইহা জানা কথা। একমাত্র আয়ের হিসাব লইয়া পশ্চিমবঙ্গের তুলনায় ত্রিপুরার কৃষি-শ্রমিকদের আর্থিক অবস্থা ভাল, এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে ভুল হইবে। কারণ, পশ্চিমবঙ্গে কৃষকের বাৎসরিক আয় যেমন ৬২২ টাকা, তেমনি ব্যয় ৬৩৬ টাকা। পক্ষান্তরে ত্রিপুরায় আয়-ব্যয়ের আনুপাতিক হার ( ratio )—৬৭৫ : ৯০৮ টাকা। এই স্থলে উল্লেখযোগ্য যে, পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরার কৃষক-পরিবারের গড়পড়তা লোকসংখ্যা যথাক্রমে ৩·৯ ও ৪·০।

আয়-ব্যয়ের এই আনুপাতিক হিসাব বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, পশ্চিমবঙ্গে কৃষকের মাথা-পিছু বাৎসরিক আয় ১৬০ টাকা, ব্যয় ১৬৩ টাকা। ত্রিপুরার ক্ষেত্রে আয় ও ব্যয় যথাক্রমে ১৬৯ ও ২২৭ টাকা। অর্থাৎ ঘাটতির পরিমাণ পশ্চিমবঙ্গের তুলনায় ত্রিপুরায় অনেক বেশী।

শতকরা হিসাবে বিভিন্ন খাতে ব্যয়ের পরিমাণ কত, নিচের হিসাবটি লক্ষ্য করিলে তাহা বুঝা যাইবে ঃ

| | খাদ্য | বস্ত্র ইত্যাদি | জ্বালানী ও বাতি | ঘড় ভাড়া ও মেরামত | বিবিধ |
|---|---|---|---|---|---|
| পশ্চিমবঙ্গ : | ৮৫·৪% | ৪·৮% | ১·৩% | ০·৯% | ৭·৬% |
| ত্রিপুরা : | ৮৯·৩% | ২৮% | ০·৭% | ১·৪% | ৪·৮% |

**ঋণের বোঝা**

আয় ও ব্যয়ের মধ্যে ব্যবধান যেখানে এত বেশী, সেখানে সাধারণ লোকের ঋণ করা ছাড়া আর গত্যন্তর কী? আর এই ঋণের পরিমাণও যে সামান্য নয়, ইহা বলাই বাহুল্য।

পশ্চিমবঙ্গে কৃষিজীবীদের মধ্যে পরিবার-পিছু ঋণের পরিমাণ ১৬3 টাকা; অ-কৃষিজীবীদের ক্ষেত্রে ৭৫ টাকা। কৃষিজীবী এবং অ-কৃষিজীবীদের একত্রে ধরিলে পরিবার-পিছু ঋণের পরিমাণ দাঁড়ায় ১২৭ টাকা। ইহার পাশাপাশি ত্রিপুরার অবস্থা লক্ষণীয় ঃ

কৃষিজীবী........................২২০ টাকা

অ-কৃষিজীবী...................... ৪৮ „

একত্রে.........................১৭৩ „

রাজ্যবাসী বিভিন্ন শ্রেণীভুক্ত সমস্ত পরিবারের মধ্যে মোট ঋণের অঙ্ক ভাগ করিয়া উপরের হিসাব পাওয়া গিয়াছে। শুধু মাত্র সমস্ত ঋণগ্রস্ত পরিবারের মধ্যে ভাগ করিলে পরিবার-পিছু ঋণের যে চিত্র পাওয়া যায়, তাহা এইরূপ :

| | কৃষিজীবী | অ-কৃষিজীবী | একত্রে |
|---|---|---|---|
| পশ্চিমবঙ্গ : | ২৬১ | ১৭০ | ২৩০ |
| ত্রিপুরা | ৩৮৭ | ২৬৫ | ৩৭৪ |

পশ্চিমবঙ্গের তুলনায় ত্রিপুরা রাজ্যে পরিবার-পিছু ঋণের পরিমাণ বেশী হইলেও ঋণগ্রস্ত পরিবারের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম। অঙ্কের হিসাব দ্বারা বক্তব্যটি পরিষ্কার করা হইল :

| ঋণগ্রস্ত পরিবারের সংখ্যা | | | |
|---|---|---|---|
| রাজ্য | কৃষিজীবী | অ-কৃষিজীবী | একত্রে |
| পশ্চিমবঙ্গ | ৬৩·০% | ৪৪·০% | ৫৫·১% |
| ত্রিপুরা | ৫৬·৮% | ১৮·১% | ৪৬·১% |

প্রসঙ্গতঃ একটি কথা উল্লেখযোগ্য। ত্রিপুরার মোট জনসংখ্যার এক ক্ষুদ্র অংশ, অর্থাৎ কৃষি-মজুরশ্রেণী মোট ঋণের বোঝার বৃহত্তর ভাগ বহন করিতেছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক পরিচালিত Rural Credit Surveyর হিসাবে কৃষিমজুরদের প্রায় শতকরা ৯০ জন ঋণগ্রস্ত। ইহাদের পরিবার-পিছু ঋণের পরিমাণও ২২০ টাকার ঊর্ধ্বে।

**সুদের হার**

রাজতন্ত্রের আমলে সরকার হইতে কৃষকদের ঋণ দেওয়ার কোন ব্যবস্থা ছিল না।

সমবায় আন্দোলনের ত সবেমাত্র সূত্রপাত হইল। এই অবস্থায়

কৃষকরা ঋণের জন্য কাহার নিকট যায়? পূর্বোল্লিখিত Rural Credit Surveyর মতে ত্রিপুরার কৃষকশ্রেণী তাহাদের মোট ঋণের শতকরা কুড়িভাগ পেশাদার মহাজন বা 'সাউকার'-এর নিকট হইতে পাইয়া থাকে। আত্মীয়-স্বজনের নিকট প্রাপ্ত ঋণের পরিমাণও সামান্য নয়। হাণ্টার সাহেবের বর্ণনা অনুসারে পূর্বে পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসিগণ প্রধানতঃ রাজ-কর্মচারীদের নিকট হইতে ধার লইত।

সুদের হার ছিল অদ্ভুত ধরনের। প্রথম বৎসরের জন্য কিছুই দিতে হইত না। দ্বিতীয় ও তৃতীয় বৎসরে দেয় সুদের হার ছিল যথাক্রমে শতকরা ৩৬ ও ৭৪ টাকা! ইহার পর ঋণ যত বৎসরেই পরিশোধ করা হউক না কেন, আর সুদ লাগিত না। বর্তমানকালে সুদের হার সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায় না। এই কারণে সুদ-রূপ অক্টোপাসের বন্ধন হইতে কৃষকগণ ইদানীং কতখানি মুক্তি পাইয়াছে, ইহা নিশ্চিত করিয়া বলা শক্ত।

ব্যবসায় হিসাবে মহাজনী বরাবরই লোভনীয় ছিল। হাণ্টার লিখিয়াছেন যে, উদ্বৃত্ত অর্থ বা সঞ্চয় জমিতে বিনিয়োগ না করিয়া মাটির নিচে পুঁতিয়া রাখা অথবা কর্জ দেওয়ার প্রচলনই জনসাধারণের মধ্যে বেশী ছিল। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বিবরণীতে উল্লেখ আছে যে, ত্রিপুরায় প্রতি একশত জন কৃষকের মধ্যে দশজনের বেশী সঞ্চিত অর্থ লগ্নি-কারবারে নিয়োগ করাই অধিকতর পছন্দ করে। যেখানে সঞ্চিত অর্থ-বিনিয়োগের কোন বিকল্প পথ খোলা নাই, সেখানে কৃষিজীবীদের মধ্যে এই লগ্নি-প্রবণতা স্বাভাবিক।

**সহরবাসীর ইতিকথা**

ত্রিপুরায় মোট ৬,৩৯,০২৯ জন অধিবাসীর মধ্যে ১,৫৭,৮৩৯ জন

লোক অ-কৃষিজীবী। শতকরা হিসাবে এই সংখ্যা মোট জনসমষ্টির প্রায় ২৫ ভাগ। জীবিকা সম্পর্কে আলোচনায় দেখিয়াছি যে, অ-কৃষিজীবীদের বৃহত্তম অংশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসায়ে লিপ্ত অথবা অফিস-আদালতে কর্মচারী হিসাবে নিযুক্ত। ইহারা মোট জনসংখ্যার প্রায় শতকরা ১২ ভাগ, অ-কৃষিজীবীদের শতকরা প্রায় ৪৮ ভাগ। ইহাদের প্রধানতঃ সহরবাসী বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়।

প্রয়োজনীয় তথ্যের অভাবে এই শ্রেণীভুক্ত ব্যক্তিদের জীবনযাত্রার মান সঠিকভাবে নির্ণয় করা সম্ভব নয়। পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, অ-কৃষিজীবীদের মধ্যে শতকরা ১৮.১টি পরিবার ঋণগ্রস্ত। ইহা হইতে সমগ্রভাবে অ-কৃষিজীবীদের আর্থিক অবস্থার আংশিক অনুমান করা যায়। ১৯৫১ সালেব সেন্সাসে বৃত্তি বা জীবিকার ভিত্তিতে মোট জনসংখ্যাকে আটটি শ্রেণীতে ভাগ করা হইয়াছে। প্রথম চারিটি শ্রেণী লইয়া কৃষি-বর্গ গঠিত। শেষের চারিটি অর্থাৎ পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণী অ-কৃষিবর্গের অন্তর্ভুক্ত। সংখ্যার দিক হইতে অ-কৃষিজীবীদের মধ্যে অষ্টম শ্রেণীই প্রধান। উকিল, ডাক্তার, দোকান-কর্মচারী, অফিস-আদালতে নিযুক্ত কর্মী প্রভৃতি এই শ্রেণীতে পড়েন। অ-কৃষিজীবী চারিটি শ্রেণীর কোন অংশ এই ঋণের কী পরিমাণ ভার বহন করিতেছে, তাহা বলার উপায় নাই।

প্রসঙ্গতঃ সরকারী কর্মচারীদের কথা উল্লেখযোগ্য। অষ্টম শ্রেণীভুক্ত লোকদের মোট সংখ্যা ৭৫,৭০৫। তন্মধ্যে সরকারী কর্মচারীর সংখ্যা ৭,১৭৩—অর্থাৎ শতকরা প্রায় দশজন।

এক সরকারী হিসাব হইতে জানা যায় যে, ১৯৫৪ সালের

জুন মাসে মাসিক ৫১ টাকার নিচে বেতন পান, এমন সরকারী কর্মচারীর সংখ্যা ছিল শতকরা প্রায় ৬১ জন। ৫১-১০০ টাকা পর্যন্ত যাহাদের বেতন, তাহাদের সংখ্যা শতকরা প্রায় ৩১ জন। অর্থাৎ ঐ সময়ে কর্মচারীদের শতকরা প্রায় ৯২ জনেব মাসিক বেতন ছিল ১০০ টাকার নিচে। মনে রাখা প্রয়োজন যে, এই স্থলে শুধু মাত্র মূল বেতনের হিসাবই দেওয়া হইয়াছে—মোট আয়ের নয়।

১৯৫৩-৫৪ সালে রাজ্যের মোট রাজস্ব আদায় হইয়াছিল ২৭,৭৬,০০০ টাকা। ঐ বৎসর একমাত্র সবকারী কর্মচারীদেব মূল বেতন হিসাবে ব্যয়ের পরিমাণ ছিল প্রায় ৪১ লক্ষ টাকা। বিভিন্ন-প্রকার ভাতার হিসাব লইলে এই সংখ্যা আরও অনেক বৃদ্ধি পাইবে। অবশ্য ইহাতে বিস্মিত হইবাব কোন কারণ নাই। জন-কল্যাণ রাষ্ট্রে এই কেন্দ্র-শাসিত অনগ্রসব রাজ্যের জনসাধারণেব মঙ্গলের জন্য যে সকল পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহা কার্যে পরিণত করিবার উদ্দেশ্যে সবকারী যন্ত্রকেও প্রয়োজন-অনুপাতে সম্প্রসারিত করাই স্বাভাবিক। এই সঙ্গে ইহাও স্বীকার্য যে, আয় ও ব্যয়ের মধ্যে এই বিপুলপবিমাণ ঘাটতি বেশীদিন চলিতে পাবে না। বিভিন্ন ধরনের পরিকল্পনা বাস্তবে রূপান্তরিত হইলে জন-সাধারণের সম্মুখে জীবিকাব নূতন নূতন পথ খুলিয়া যাইবে, তাহাদেব আয় বাড়িবে এবং এই বর্ধিত আয়ের প্রতিফলন রাজস্বের উপবও পড়িবে। সরকারী তহবিলের বর্তমান ঘাটতি-পূরণের ইহাই একমাত্র পথ। এই কাজ যত ত্বরান্বিত হয়, ততই রাজ্যবাসীদের পক্ষে মঙ্গল।

# নবম অধ্যায়

## সাংস্কৃতিক জীবন

সংস্কৃতি বলিতে আমরা সাধারণতঃ সাহিত্য, সঙ্গীত, ললিত-কলা ইত্যাদি বুঝি। প্রকৃত পক্ষে ইহার অর্থ আরও ব্যাপক। কোন নির্দিষ্ট সমাজের সংস্কৃতির সম্পূর্ণ পরিচয় পাইতে হইলে সামাজিক রীতি-নীতি, জীবন-ধারণের বাস্তব উপকরণ এবং ভাব বা মানস-সম্পদ ইত্যাদি সমস্ত কিছুরই খোঁজ লইতে হয়। এই স্থলে অবশ্য প্রচলিত অর্থেই ইহা ব্যবহৃত হইয়াছে। ত্রিপুরায় সাহিত্য ও শিল্প-কর্মের যে সকল উল্লেখযোগ্য নিদর্শন পাওয়া যায়, সেই সম্পর্কে আলোচনা করাই আমাদের বর্তমান উদ্দেশ্য।

বিস্তৃত আলোচনায় অগ্রসর হইবার পূর্বে একটি কথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন। অন্যান্য স্থানে যেমন, ত্রিপুরা রাজ্যেও তেমনি দুইটি সাংস্কৃতিক ধারা বহুকাল হইতে পাশাপাশি চলিয়া আসিতেছে। ইহাদের একটি লোকসংস্কৃতির ধারা। অলিখিত অসংখ্য লোকগাথা ও সঙ্গীত প্রভৃতিকে আশ্রয় করিয়া এই ধারা নিরবচ্ছিন্ন ভাবে বহিয়া আসিয়াছে। অপরটি দরবার-আশ্রয়ী সংস্কৃতি-প্রবাহ, যাহা প্রধানতঃ রাজানুগ্রহে পুষ্টি লাভ করিয়াছে।

সাহিত্য ও ললিত-কলা বিষয়ে ত্রিপুরার রাজন্যবর্গের অনুরাগ সুবিদিত। রাজা ত্রিলোচনের শিল্পানুরাগ সম্পর্কে একটি চমৎকার কাহিনী প্রচলিত আছে। কাহিনীটি পরে বলা হইবে। এই কথা আজ সকলেই স্বীকার করেন যে, ত্রিপুরার 'দরবারী সংস্কৃতি' মুখ্যতঃ বাঙালী ও বাঙলা ভাষার সঙ্গে সংযোগের ফল।

জনসংখ্যা সংক্রান্ত আলোচনা-প্রসঙ্গে জানিতে পারিয়াছি যে, বর্তমানে ত্রিপুরার বেশির ভাগ লোক বাঙালী। বাঙলাই এই রাজ্যের সর্বাধিক প্রচলিত ভাষা। কিন্তু এক শতাব্দী আগেও অবস্থা অন্যরূপ ছিল। ইহা অপেক্ষাও বড় কথা এই: বহুযুগ ধরিয়া একাধিক রাজত্বের উত্থান-পতন সত্ত্বেও ত্রিপুরা কোন কালেই বাঙলা দেশের অন্তর্ভুক্ত হয় নাই। তথাপি এই দুই রাজ্যের মধ্যে সাংস্কৃতিক যোগাযোগ অপরিহার্য ছিল। ত্রিপুরার ভৌগোলিক অবস্থানের কথা স্মরণ রাখিলে বক্তব্যটা বুঝা সহজ হইবে।

একমাত্র পূর্বদিক বাদ দিলে ত্রিপুরা সকল দিকেই বাংলা ভাষা-ভাষী অঞ্চল দ্বারা পরিবেষ্টিত। উত্তর-পূর্বে ও উত্তরে কাছাড় জেলা, পশ্চিমে শ্রীহট্ট ও কুমিল্লা, দক্ষিণ-পশ্চিমে নোয়াখালী এবং দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব দিকে চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম পর্যন্ত সমগ্র অঞ্চলেই বাঙলা মাতৃভাষা রূপে কথিত হয়। অতীতে ত্রিপুরা রাজ্যের সীমা এত ক্ষুদ্র ছিল না—উত্তর ও পশ্চিম দিকে বহুদূর বিস্তৃত ছিল। তখনও এই রাজ্যের উত্তর ও পশ্চিম সীমান্ত-অঞ্চলে ভাষা ছিল অসমিয়া ও বাঙলা। আর বাঙলা ও অসমিয়া ভাষাদ্বয় যে মূলে একই ভাষা ছিল, ইহা ত জানা কথা। এই অবস্থায় বাঙলা ভাষার সঙ্গে ত্রিপুরাবাসীদের পরিচয় ঘটা খুবই স্বাভাবিক।

মধ্যযুগ হইতে ত্রিপুরায় বাঙালীর আগমন সুরু হইয়াছিল—এই আগমনধারাতে কখনও ছেদ পড়ে নাই। ইহা ইতিহাসের সাক্ষ্য। যখনই বাঙলা দেশে কোন রাজনৈতিক উপদ্রব দেখা দিয়াছে, কিংবা অন্নসমস্যা কঠোর হইয়া উঠিয়াছে, তখনই বাঙলার অধিবাসীরা দলে দলে ত্রিপুরা রাজ্যে আশ্রয় লাভ করিয়াছে। ইহার ফলে

ত্রিপুরা-বাঙালীর জীবন-সমস্যাই শুধু জড়াইয়া যায় নাই, তাহাদের সংস্কৃতি এবং ভাষাও একে অন্যকে প্রভাবিত করিয়াছে।

মোটামুটি হিসাবে রত্ন মাণিক্যের রাজত্বকালে ত্রিপুরা ও বাঙলা-দেশের মধ্যে প্রথম উল্লেখযোগ্য যোগাযোগ ঘটে। রত্ন মাণিক্য বাঙলার শাসনকর্তার সাহায্যে সিংহাসন অধিকার করেন—মধ্যপর্বের ইতিহাস-আলোচনায় ইহা উল্লেখ করা হইয়াছে। অনুমান হয়, তখন হইতেই ত্রিপুরায় সর্বপ্রথম সমতল বাঙলার অনুরূপ কৃষিকার্য সুরু হয়।

রত্ন মাণিক্যের রাজত্বের প্রায় দুই শত বৎসর পর ধর্ম মাণিক্যের সময় বাঙলা দেশের সঙ্গে ত্রিপুরার সম্পর্ক দৃঢ়তর হয়। বলা প্রয়োজন, এই আত্মীয়তা প্রধানতঃ কৃষ্টিগত। অনেকের মতে ধর্ম মাণিক্যের সঙ্গে মহাপ্রভুর বয়সের পার্থক্য মাত্র বার বৎসর।

যে-যুগের কথা বলা হইতেছে, সে-যুগে ফসলের প্রাচুর্য বাংলা সাহিত্য-ক্ষেত্রে এক অভূতপূর্ব সমৃদ্ধি লইয়া আসিয়াছিল। ইহা কৃত্তিবাসের রামায়ণ এবং বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসের পদাবলীর রচনা-কাল। বিস্ময়ের কথা, বাঙলা সাহিত্যক্ষেত্রে এই কল্লোল-ধ্বনি পর্বত-বেষ্টিত ত্রিপুরার অরণ্য-রাজ্যের অ-বাঙালী রাজপুরুষের চিত্তকেও চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছিল। ত্রিপুরা রাজবংশের কীর্তিকাহিনী 'রাজমালা' বাঙলা সাহিত্যক্ষেত্রে এক উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি হিসাবে স্বীকৃত হইয়াছে।

সম্প্রতি 'রাজমালা'র রচনাকাল ও ঐতিহাসিক মূল্য সম্পর্কে নানাবিধ প্রশ্ন উঠিয়াছে। রাজমালা নামে বর্তমানে যাহা আমাদের হাতে আসিয়াছে, তাহার ভাষা ও রচনা-রীতি বিশ্লেষণ করিয়া কেহ কেহ ইহাকে মধ্যযুগের একেবারে শেষের দিকের রচনা বলিয়া মনে করেন।

ইহা অবশ্য স্বীকার্য যে, রাজমালা-বর্ণিত ইতিহাসের কাহিনী সর্বাংশে গ্রহণযোগ্য নয়। বরং ইহার রচয়িতারা ইতিহাসের উপাদান অপেক্ষা কল্পনার উপরই বেশী নির্ভর করিয়াছেন। পঞ্চদশ শতাব্দীর পূর্ববর্তী কালে ত্রিপুরা-ইতিহাসের যে বর্ণনা 'রাজমালা' গ্রন্থে পাওয়া যায়, তাহার ঐতিহাসিক মূল্য একেবারেই নাই বলা যায়। কিন্তু এই ত্রুটি সত্ত্বেও রাজমালা গ্রন্থকে ইতিহাসের দৃষ্টিতে একেবারে মূল্যহীন মনে করা অযৌক্তিক। যিনি কালের সরণি বাহিয়া ইতিহাসের গূঢ় অন্তঃপুরে প্রবেশ-পূর্বক এই প্রাচীন রাজ্যের অতীত উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা করিবেন, ভাবী কালের সেই ঐতিহাসিকের পক্ষে ইহাকে একেবারে বর্জন করা নিশ্চয়ই সম্ভব হইবে না।

যাঁহারা রাজমালার প্রাচীনত্ব স্বীকার করেন না, তাঁহাদের বক্তব্য অনেকাংশে যুক্তিসঙ্গত—কিন্তু সর্বাংশে নয়। রাজমালা সম্পর্কে রেভারেণ্ড লঙের অতিশয়োক্তি বাদ দিলেও এই বিরাট গ্রন্থের সাহিত্য-মূল্য অথবা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে ইহার মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয় না। কম করিয়া ধরিলেও আজ হইতে তিনশত কিংবা চারিশত বৎসর পূর্বে ত্রিপুরার অবাঙালী নৃপতিগণ বাঙলা ভাষার প্রতি অনুরক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের পৃষ্ঠপোষকতায় ( বিষয়বস্তু যাহাই হোক) পয়ার-ছন্দে লক্ষাধিক চরণ-সংবলিত এতবড় একটি গ্রন্থ লিখিত হইয়াছিল—ইহা কি সামান্য কথা?

ত্রিপুরা সম্পর্কে প্রকাশিত অনেক রচনায় 'রাজমালা' ছাড়াও 'রাজাবলী' নামক আর একটি গ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া যায়। রাজমালা-সম্পাদক কালীপ্রসন্ন সেন মহাশয় এই পুস্তকের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, ইহা বর্তমানে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। শোনা

যায়, রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র এশিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগারে 'রাজাবলী'র একটি কপি আবিষ্কার করিয়াছিলেন। মিত্র মহাশয়ের একটি প্রবন্ধে ইহার উল্লেখ রহিয়াছে। সম্প্রতি শ্রীনীহাররঞ্জন রায় তাঁহার 'বাঙালীর ইতিহাস' গ্রন্থে রাজাবলীর উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা এবং আমাদের আলোচ্য রাজাবলী অভিন্ন কিনা বলা যায় না। মহামহোপাধ্যায় প্রসন্ন বিদ্যারত্নের মতানুসারে এই পুস্তক প্রায় নয়-শত বৎসর পূর্বে রচিত হইয়াছিল। যাহা চোখে দেখার উপায় নাই, যাহার নাম শুধুমাত্র জন-শ্রুতিতে বাঁচিয়া রহিয়াছে, সেই গ্রন্থ সম্পর্কে কোন কিছু বলা অথবা ইহার কাল-নির্ণয় করার উপায় নাই। এই কারণে ইহার বিষয় আলোচনা করা নিরর্থক।

রাজমালার কাল-নির্ণয় করা আমাদের মূল উদ্দেশ্য নয়। আসল বক্তব্য এই যে, বাঙলা দেশে যখনই সাহিত্যক্ষেত্রে কোন উল্লেখযোগ্য আলোড়ন আসিয়াছে, তখন ত্রিপুরারাজ্যেও ইহার প্রভাব পড়িয়াছে। ইহা দ্বারা বাঙলা সাহিত্য-বিকাশের মূল-ধারার সঙ্গে ত্রিপুরার সাংস্কৃতিক জীবনের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ প্রমাণিত হয়।

ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্ধে বাঙলা দেশে গোবিন্দ দাস, জ্ঞান দাস ও যদুনন্দন দাসের মত কৃতী সাহিত্যিকের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। বৃন্দাবন দাসের চৈতন্যভাগবত, লোচন দাসের চৈতন্যমঙ্গল, কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল প্রভৃতি তখনই রচিত হয়। সেই সময় ত্রিপুরা রাজ্যেও সাহিত্যসৃষ্টির উল্লেখযোগ্য নিদর্শন পাওয়া যায়। ইহা রাজমালার দ্বিতীয় লহরের রচনাকাল। 'উৎকল খণ্ড পাঁচালী' ও 'যাত্রা রত্নাকর নিধি' নামক জ্যোতিষ

গ্রন্থদ্বয়ও তখনই লেখা হয়। সপ্তদশ শতাব্দীতে বাঙলা সাহিত্য-ক্ষেত্রের উন্নতির বিশদ বিবরণ দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। এই যুগে ত্রিপুরা রাজ্যেও সাহিত্য-সৃষ্টির উৎসাহ লক্ষ্য করা যায়। দেবাই পণ্ডিতের বৃহন্নারদীয় পুরাণের অনুবাদ প্রভৃতি গ্রন্থে ইহার প্রমাণ রহিয়াছে। এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য এই যে, ভাষা ও রচনা-রীতির দিক হইতে প্রতি যুগে তৎকালীন বাঙলা সাহিত্যের প্রচলিত প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলির প্রভাব ত্রিপুবার সাহিত্য-রচয়িতাদের উপর কখনও সুস্পষ্ট, কখনও গৌণভাবে প্রকাশিত।

দুই রাজ্যের মধ্যে যোগাযোগ ত্রিপুরার পক্ষে যেমন মঙ্গল-জনক হইয়াছে, তেমনি সমগ্রভাবে বিচার করিলে বাঙলা ভাষাকে সমৃদ্ধ করিয়াছে। বহুকাল হইতে বাঙলা ত্রিপুরার রাজভাষা হিসাবে ব্যবহৃত হইয়া আসিয়াছে। তুর্কীদের বাঙলাদেশ-বিজয়ের পর বাঙলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যে উপদ্রব দেখা দিয়াছিল, তাহা ইতিহাসে সুবিদিত। ক্ষুদ্র ত্রিপুরার উপর প্রবল পরাক্রান্ত মুসলমান শক্তির রাজনৈতিক প্রভাব নিশ্চয়ই পড়িয়াছিল। কিন্তু তৎসত্ত্বেও ত্রিপুরা রাজ্যে দরবারী ভাষা হিসাবে আরবী অথবা ফারসি কোন কালেই স্বীকৃত হয় নাই। অবশ্য ইহা দ্বারা ত্রিপুরায় ফারসি ভাষার প্রভাব যে একেবারেই পড়ে নাই, এই কথা বলা হইতেছে না। রাজপরিবার-ভুক্ত অনেকে এই ভাষায় প্রভূত দক্ষতা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। কিন্তু মুসলমান যুগেও বাঙলা ত্রিপুরায় রাজ-ভাষার মর্যাদা হইতে বঞ্চিত হয় নাই—বাঙলা ভাষার পক্ষে ইহা নিঃসন্দেহে গৌরবের বিষয়।

রাজকার্যে বাঙলার সার্থক প্রয়োগের ফলে ত্রিপুরায় এক অপূর্ব

ব্যবহারিক ভাষা বা "আমলাই ভাষার" সৃষ্টি হইয়াছিল। শ্রদ্ধেয় শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় কয়েক বৎসর পূর্বে আগরতলায় প্রদত্ত এক ভাষণে এই প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, ত্রিপুরার রাজকার্যে ব্যবহৃত ভাষা সমগ্র বাঙালী জাতির গৌরবের বস্তু। পুরাতন আমলের বিচার বিভাগীয় রায়, আইন ও হুকুমনামার অনেক নিদর্শন এখনও খোঁজ করিলে সরকারী দপ্তরে পাওয়া যাইবে।

বাঙলাকে রাজভাষার মর্যাদা দান একটি লোক-দেখান ব্যাপার ছিল না। ইংরেজ আমলে অনেক ইংরেজী-শিক্ষিত আমলা-কর্মচারী নিযুক্ত হইয়াছিলেন। মন্ত্রী রমণীমোহন চট্টোপাধ্যায় ইঁহাদের একজন। চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে ইংরেজী ভাষায় আদেশাদি প্রচার করিতে দেখিয়া মহারাজ রাধাকিশোর লিখিয়াছিলেনঃ "এখানে আবহমানকাল রাজকার্যে বাঙলা ভাষার ব্যবহার এবং এই ভাষার উন্নতিকল্পে নানারূপ অনুষ্ঠান চলিয়া আসিতেছে। ইহা বঙ্গদেশের হিন্দু রাজার পক্ষে বিশেষ গৌরবজনক মনে করি। বিশেষতঃ আমি বঙ্গভাষাকে প্রাণের তুল্য ভালবাসি এবং রাজকার্যে ব্যবহৃত ভাষা যাহাতে দিন দিন উন্নত হয়, তৎপক্ষে চেষ্টিত হওয়া একান্ত কর্তব্য মনে করি। ইংরেজী-শিক্ষিত কর্মচারিবর্গের দ্বারা রাজ্যের এই চির-পোষিত উদ্দেশ্য ও নিয়ম যাহাতে ব্যর্থ না হয়, সে বিষয়ে আপনি তীব্র দৃষ্টি রাখিবেন।" সে-যুগে উচ্চশিক্ষিত বাঙালী মহলে কয়জন মাতৃভাষার প্রতি এইরূপ শ্রদ্ধা পোষণ করিতেন?

পূর্বে ত্রিপুরার রাজগণ রাজ্যাভিষেক, রাজ্যজয় ইত্যাদি ঘটনা স্মরণীয় করিয়া রাখার উদ্দেশ্যে মুদ্রা বা মোহর তৈরী করাইতেন। এই সকল প্রাচীন মোহরের অনেকগুলি ইদানীং পাওয়া গিয়াছে।

মোহরগুলি বাঙলা ভাষায় অথবা সংস্কৃত ভাষায় বাঙলা অক্ষরে মুদ্রিত। এই রকম একটি মোহর বুকে আঁটিয়া কর্ণেল মহিম ঠাকুর একবার বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে মহিমচন্দ্র একটি প্রবন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা এই: "তখন আমার বাবুয়ানা বেশের মধ্যে সোনার চেইন ও ঘড়ি ছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় উচিতবক্তা, তিনি একটু বিরাগভাবে আমার সোনার চেইনের মধ্যে দোদুল্যমান মোহরের প্রতি দৃষ্টি করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—'ও মোহরটা কিসের মোহর?' আমি কম্পিত-কলেবরে তাঁহার নিকট এই মুদ্রাখণ্ড দেখাইলে তিনি পাঠ করিলেন—'শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণপদে শ্রীশ্রীযুত মহারাজা গোবিন্দ মাণিক্য দেব—শ্রীশ্রীমতী গুণবতী দেব্যা।' বৃদ্ধ তখন লাফাইয়া উঠিলেন এবং উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলীকে ডাকিয়া বলিলেন—'তোমরা দেখ আমার বঙ্গভাষা রাজভাষা! বাঙলা অক্ষরে এই স্বর্ণমুদ্রা মুদ্রিত হইয়াছে'।"

বাঙলা ভাষাকে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠা-কল্পে যিনি সারা জীবন অক্লান্ত সাধনা করিয়া গিয়াছেন, সেই মহাপ্রাণ পুরুষের পক্ষে মাতৃভাষার রাজসম্মান-প্রাপ্তিতে আনন্দিত হওয়া স্বাভাবিক।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ত্রিপুরার আন্তরিকতা সুবিদিত। বাঙলা ভাষার প্রতি ত্রিপুরার রাজন্যবর্গের সুগভীর মমতা এবং ত্রিপুরার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সম্পর্কে কবিগুরুর অকৃত্রিম শ্রদ্ধা এই সম্প্রীতিকে দৃঢ় করিয়াছে—সেই সঙ্গে দৃঢ়তর করিয়াছে দুই রাজ্যের মধ্যে প্রাচীন বন্ধুত্বকেও। রাজ-অন্তঃপুরে বাঙলা ভাষার কিরূপ চর্চা ছিল, রাধাকিশোরের প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত বহু রচনায় তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

প্রসঙ্গতঃ আরও দুইজনের নাম উল্লেখযোগ্য। একজন বর্তমান ভারতবর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত-শিল্পী শচীন দেব বর্মণের পিতা নবদ্বীপ বাহাদুর। অপর জন রাধাকিশোরের ভগিনী মহারাজ-কুমারী অনঙ্গমোহিনী দেবী। ঈশানচন্দ্রের মৃত্যুর পর উত্তরাধিকার-সূত্রে নবদ্বীপ বাহাদুরের সিংহাসন-প্রাপ্তির কথা ছিল। ইংরেজ আদালতের বিচারে রাজ্য হারাইয়া তিনি স্বেচ্ছায় ত্রিপুরা পরিত্যাগ-পূর্বক কাশীবাসী হন। কয়েক বৎসর পর স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া তিনি সাহিত্য ও শিল্প-চর্চায় আত্মনিয়োগ করেন। তাঁহার বিচিত্র অভিজ্ঞতাপূর্ণ জীবন-স্মৃতি "আবর্জনার ঝুড়ি" নাম লইয়া অধুনালুপ্ত "ত্রিবেণী" সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহাতে শুধু ত্রিপুরা নয়, সমসাময়িক কালের কলিকাতা ও বাঙলা দেশের একটি সুন্দর চিত্র পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া আগরতলা হইতে প্রকাশিত "রবি" পত্রিকায় "বাঙলা সাহিত্যের চারিযুগ" নামে তাঁহার পাণ্ডিত্যপূর্ণ ধারাবাহিক আলোচনা তৎকালে শিক্ষিত সমাজের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল।

অনঙ্গমোহিনী দেবীর নাম বাঙলা দেশের শ্রেষ্ঠ মহিলা-কবিদের সঙ্গে স্মরণীয়। "কণিকা", "প্রীতি" ও "শোকগাথা"—এই তিনটি কাব্যগ্রন্থ তাঁহার কবি-প্রতিভার উজ্জ্বল স্বাক্ষর বহন করিতেছে।

রবীন্দ্রনাথের সংস্পর্শে ত্রিপুরার উর্বর সাহিত্যক্ষেত্র পত্রপুষ্পে শ্রীমণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছিল। আগরতলার "বঙ্গভাষা" নামক সাহিত্য-পত্রে রবীন্দ্রনাথের "গুপ্তধন" গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয়।

"রাজর্ষি" ও "বিসর্জনে" রবীন্দ্রনাথ ত্রিপুরার ইতিহাসের এক বিস্মৃত অধ্যায়কে অমর করিয়া রাখিয়াছেন। কাহিনীর ঐতিহাসিক

যথার্থতা সম্পর্কে প্রশ্ন তুলিয়া লাভ নাই। বস্তুতঃ ইতিহাসের তথ্য যে যথাযথ পরিবেশিত হয় নাই, এই আশংকা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথেরও হইয়াছিল। বীরচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে পত্র-বিনিময়ে এই সম্পর্কে উভয় পক্ষের স্বীকৃতিই পাওয়া যায়। কিন্তু সাহিত্যমূল্যে "রাজর্ষি" ও "বিসর্জন" অনবদ্য—ঐতিহাসিক ত্রুটি সত্ত্বেও বই দুইটী ত্রিপুরার মানুষের অতি প্রিয়। গোবিন্দ মাণিক্যের চরিত্রাংকনের মধ্য দিয়া ত্রিপুরার রাজশক্তির অন্তর্নিহিত মহত্ত্ব প্রকাশ করার জন্য ত্রিপুরাবাসী রবীন্দ্রনাথের নিকট কৃতজ্ঞ থাকিবে। এই সঙ্গে ইহাও স্বীকার্য যে, বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি গভীর অনুরাগ দ্বারা ত্রিপুরার রাজন্যবর্গও সমগ্রভাবে বাঙলা দেশ ও বাঙালী জাতিকে এক অপরিশোধ্য ঋণজালে আবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

আর্থিক দৈন্য অতীতে বাঙলাদেশের অনেক কৃতী সাহিত্যিকের জীবন বিড়ম্বিত করিয়াছে। কবি হেমচন্দ্রের অন্ধত্ব-প্রাপ্তি ও দারিদ্র্যের কথা শুনিয়া রাধাকিশোর রবীন্দ্রনাথের মারফত তাঁহাকে মাসিক অর্থ সাহায্যের প্রস্তাব করিয়া মন্তব্য করেন: "আমি বাঙলার ক্ষুদ্র রাজা হইলেও বর্তমানে তাঁহাকে যদি কবি মাইকেল মধুসূদনের মত দাতব্য চিকিৎসালয়ে পড়িয়া মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে হয় তবে দেশের পরম দুর্ভাগ্য।" দৃষ্টান্ত আরও আছে। বসু বিজ্ঞান মন্দিরের সাহায্যকল্পে রবীন্দ্রনাথ রাধাকিশোরের নিকট আবেদন জানাইয়া অপ্রত্যাশিত উত্তর পাইয়াছিলেন: "এ-বেশ আপনাকে সাজে না, আপনার বাঁশী বাজানই কাজ। আমরা ভক্তবৃন্দ ভিক্ষার ঝুলি বহন করিব। প্রজাবৃন্দের প্রদত্ত অর্থই আমার রাজ-ভোগ জোগায়। আমাদের অপেক্ষা জগতে কে বড় ভিক্ষুক আছে?

এ ভিক্ষার ঝুলি আমাকেই শোভা পায়, আমাকেই ইহা পূর্ণ করিতে হইবে।”

বলা বাহুল্য, এই উদ্দেশ্যে রাধাকিশোর প্রচুর অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন। তাঁহার পরলোকগমনের পর আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু বিজ্ঞান মন্দিরের প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে এই মহৎ দানের কথা কৃতজ্ঞচিত্তে প্রকাশ করিয়াছিলেন।

ইহার পর কি আর উল্লেখের প্রয়োজন আছে যে, বাঙলা ভাষার প্রতি ত্রিপুরার এই অনুরাগ সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাকৃত—ইহা তথাকথিত বাঙালী “আধিপত্যের” ফল নয়?

**সঙ্গীত**

ত্রিপুরা রাজ্যকে সঙ্গীতের দেশ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। প্রাকৃতিক রূপ-বৈচিত্র্যের অধিকারী এই অরণ্য-প্রদেশে সঙ্গীতের সর্বজনীনতা স্বীকৃত। বলা বাহুল্য, এই ঐতিহ্য একদিনে গড়িয়া উঠে নাই। সঙ্গীতের ক্ষেত্রে ত্রিপুরার রাজন্যবর্গের গভীর অনুরাগ সুবিদিত। বীরচন্দ্রের রাজসভায় তৎকালীন শ্রেষ্ঠ শিল্পিবৃন্দের সমাবেশ ঘটিয়াছিল: যন্ত্রসঙ্গীতে নিসার হোসেন, কাশেম আলি খাঁ, হাইদর খাঁ, নবীনচন্দ্র গোস্বামী প্রভৃতি সাধকগণের সঙ্গে স্থান পাইয়াছিলেন ভোলানাথ চক্রবর্তী ও যদু ভট্টের মত সঙ্গীতাচার্যগণ। জীবিত সুর-সাধকদের মধ্যে গুরু-স্থানীয় ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ-ও ত্রিপুরার রাজসভার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বহু প্রতিভার অবদানে ত্রিপুরার মাটিতে সঙ্গীত-সাধনার এক মনোরম পরিবেশ গড়িয়া উঠিয়াছে। সঙ্গীতের ক্ষেত্রে ত্রিপুরার মহৎ ঐতিহ্যের

কুশলী বাহক এযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সুর-শিল্পী শচীন দেব বর্মণ।

## বয়ন ও ভাস্কর্য

সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ত্রিপুরার সাফল্য সম্পর্কে আলোচনা-প্রসঙ্গে শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখিয়াছেন ঃ স্থাপত্য-শিল্পে তাহাদের সাফল্য সামান্য নয়। প্রাচীন মন্দির ও প্রাসাদগুলির দিকে তাকাইলেই ইহা বুঝা যায়। দুর্ভাগ্যবশতঃ এই সকল প্রাচীন নিদর্শন বহুলাংশে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। রঙিন রেশম ও কার্পাস-জাত কোন কোন ত্রিপুরী বস্ত্র, বিশেষতঃ স্বর্ণ ও রৌপ্যের বিচিত্র কারুকার্য-খচিত রেশমের 'রিয়া' বা বক্ষাবরণ বয়নশিল্পের এক বিশিষ্ট ও সুন্দর নিদর্শন, যাহা দ্বারা ত্রিপুরা প্রভূত খ্যাতি অর্জন করিয়াছে। ধাতুর কাজ, কাঠখোদাই এবং ভাস্কর্যে ত্রিপুরাগণ শিল্পপ্রতিভার পরিচয় দিয়াছে। ভারতবর্ষের পূর্বাঞ্চল, বিশেষ ভাবে পূর্ববঙ্গের ইতিহাস ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ত্রিপুরার অবদান এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে।

ত্রিপুর-রমণীদের দ্বারা প্রস্তুত 'রিয়া' বয়নশিল্পের এক অপূর্ব নিদর্শন সন্দেহ নাই। ত্রিপুরাস্থ প্রথম ইংরেজ রেসিডেণ্ট রালফ্ লিক রাজদরবার হইতে প্রাপ্ত একটি 'রিয়া' বৃটিশ মিউজিয়মের শিল্প-সংগ্রহ বিভাগে প্রদান করিয়াছিলেন। এই রাজ্যে বয়ন-শিল্পের চর্চা প্রাচীন কাল হইতে চলিয়া আসিয়াছে। মহারাজ ত্রিলোচনের শিল্পানুরাগ সম্পর্কে একটি কাহিনীর উল্লেখ ইতিপূর্বে করা হইয়াছে। 'রাজমালা'-সম্পাদক কাহিনীটি এই ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

"রাজা সুবড়াই ( ত্রিলোচন ) রাজ্যমধ্যে ঘোষণা করিলেন যে, যে ত্রিপুর-রমণী শিল্পকলার উৎকৃষ্ট আদর্শ দেখাইতে সমর্থ হইবে, তাহাকে তিনি বিবাহ করিবেন। এই উৎসাহজনক ঘোষণার ফলে নিত্য-নূতন শিল্পপ্রণালী উদ্ভাবিত হইতে লাগিল এবং শিল্প-নিপুণ মহিলাগণ রাজমহিষীর সুদুর্লভ আসন লাভ করিতে লাগিলেন। একদা একটি যুবতী সুচারু কারুকার্য-খচিত একখানি 'রিয়া' ( কাঁচুলি ) রাজার সম্মুখে উপস্থিত করিলেন। মাছির পাখায় সূর্যরশ্মি পতিত হইলে যে রঙ উদ্ভাসিত হয়, রিয়াখানা তাহার অনুকরণে বয়ন করা হইয়াছিল। মহারাজ শিল্পসৌন্দর্য-দর্শনে বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইলেন। তিনি যুবতীকে জিজ্ঞাসা কবিলেন—'মাছি অধিক কাল একস্থানে স্থির থাকে না, এরূপ অবস্থায় তুমি কি প্রকারে তাহার অনুকরণ করিলে?' যুবতী বলিলেন—'আমাদের বাড়ীর একটি স্থানে সর্বদা মাছ বসিয়া থাকে, তাহা দেখিয়া অনুকরণ করাব সুযোগ পাইয়াছি এবং মহারাজের প্রীত্যর্থে তদবলম্বনে এই বস্ত্র বয়ন করিয়াছি।' এই কথা শ্রবণে কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া সেই স্থানটি দেখিবার নিমিত্ত রাজা যুবতীব বাড়ীতে গেলেন। দেখিলেন, একটি স্থানে সর্বদাই অসংখ্য মাছি বসিয়া থাকে, তাড়াইলেও যায় না, ঘুরিয়া ফিরিয়া আবার আসিয়া বসে। মহারাজ ইহার কারণ স্থির করিতে না পারিয়া সেই স্থানের মৃত্তিকা খনন করাইয়া দেখিলেন, একটি মৃত সর্প প্রোথিত রহিয়াছে। মহারাজের বড়ই আদরের একটি সর্প ছিল। সে সর্বদা তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিত। অনুসন্ধানে জানা গেল, যুবতীর পিতা সেই সর্পটিকে বধ করিয়া উক্ত স্থানে প্রোথিত করিয়াছে। এই ঘটনা-দর্শনে মহারাজ দুঃখিত হইয়া বলিলেন—'এই সর্প স্বর্গের

গন্ধর্ব। কোন কারণে শাপগ্রস্ত হইয়া সর্পরূপে আমার আশ্রয় লইয়াছিল। সর্পের সহিত আমার কথা ছিল, আমাকে প্রতিদিন সে এক-একটি নূতন শিল্প-কার্য শিখাইবে এবং আমার রাজ্যমধ্যে তাহা প্রকাশ করিব। এই উপায়ে এক বৎসরের মধ্যে ক্রমান্বয়ে ৩৬০টি শিল্পাদর্শ আমার প্রজাগণ শিক্ষা করিবে ··তন্মধ্যে মাত্র ২৪০টি আদর্শ উদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছি। সর্প যখন স্বর্গগামী হইয়াছে, তখন আর নূতন শিল্পাদর্শ পাইবার আশা নাই। সুতরাং এখন আমার রাজত্ব করা বৃথা। আমি চলিলাম, তোমরা তোমাদের অদৃষ্ট লইয়া থাক।' এই কথা বলিয়া মহারাজ অন্তর্ধান হইলেন। যে স্থানে সর্পটি প্রোথিত হইয়াছিল, তথায় 'খুমপুই' নামক ফুলের গাছ জন্মিয়া ফুটন্ত পুষ্পের সৌরভ বিস্তার করিতে লাগিল।"

এই আশ্চর্য রূপকথার মধ্য দিয়া ত্রিপুরার রাজন্যবর্গের প্রগাঢ় শিল্প-প্রীতি এবং রাজ্যমধ্যে বয়নশিল্পের উৎকর্ষের এক সুন্দর চিত্র পরিবেশিত হইয়াছে।

*　　　*　　　*

ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে ভাস্কর্যের অনেক নিদর্শন ছড়াইয়া রহিয়াছে। ইহাদের মধ্যে **উনকোটি** ও **দেবতামুড়ার** মূর্তি-নিচয় সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। উনকোটি এই রাজ্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ তীর্থস্থান। ইহা কৈলাসহর বিভাগের অন্তর্গত। তীর্থ-সংলগ্ন শিলাময় পর্বত-গাত্রে বহুসংখ্যক দেবমূর্তি খোদিত আছে। এতদ্ব্যতীত অনেক-গুলি প্রস্তর-মূর্তি বিক্ষিপ্ত ভাবে পড়িয়া রহিয়াছে। ইহাদের মধ্যে **"উনকোটীশ্বর কালভৈরব"** নামে খ্যাত ত্রিনয়ন-বিশিষ্ট বিরাট মুণ্ডটি

বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। ইহার কর্ণযুগলের মধ্যে ব্যবধান প্রায় চৌদ্দ হাত। শিল্প-রীতির বিচারে মুণ্ডটি বৈচিত্র্যহীন। এই দিক হইতে বরং ত্রিমুখ-বিশিষ্ট আর একটি মূর্তি প্রশংসার যোগ্য। শ্রীনীহাররঞ্জন রায় উনকোটিকে পাল-পর্বের শৈবতীর্থ বলিয়া উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন যে, পূর্ব-ভারতে বারাণসীর কোটি তীর্থের পরই উনকোটির স্থান। উনকোটি শৈব তীর্থ হইলেও এই স্থলে শিবের সঙ্গে বিষ্ণুও পূজা লাভ করেন।

উদয়পুর ও অমরপুর বিভাগের মধ্যবর্তী স্থানে বড়মুড়া পর্বত-শ্রেণীর একাংশে কতিপয় দেবমূর্তি শ্রেণীবদ্ধ ভাবে খোদিত আছে। এই স্থান দেবতামুড়া নামে খ্যাত। কাল-প্রভাবে এবং উপযুক্ত সংরক্ষণ-ব্যবস্থার অভাবে মূর্তিগুলি স্থানে স্থানে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে। এই দুর্গম অরণ্যমধ্যে এই সকল দেবমূর্তি কাহার দ্বারা কী উদ্দেশ্যে খোদিত হইয়াছিল, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলার উপায় নাই। সম্ভবতঃ বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব রোধ এবং হিন্দুধর্মের প্রচার-উদ্দেশ্যেই মূর্তিগুলি খোদিত হইয়াছিল।

## লোক-সংস্কৃতির ধারা

ত্রিপুবার প্রায় আড়াই লক্ষ আদিবাসীর জীবন-প্রণালী—তাহাদের বিবিধ সামাজিক অনুশাসন, পূজা-পার্বণের নিয়মাচার, জীবন-ধারণের বাস্তব উপকরণ ও পদ্ধতি, নানাবিধ শিল্প-কর্ম, নৃত্য ও সঙ্গীত—এই সকলই লোক-সংস্কৃতির আশ্রয়।

ভাষা প্রসঙ্গ আলোচনায় দেখিয়াছি, বাঙলার পরই ত্রিপুরী বা টিপ্‌রা এই রাজ্যের সর্বাধিক প্রচলিত ভাষা। এই ভাষার কোন

নিজস্ব লিপি নাই। ত্রিপুরার পাহাড়-অঞ্চলে অজস্র গল্প, গাথা, গীত ইত্যাদি লোকমুখে প্রচারিত হইয়া যুগপরম্পরায় বাঁচিয়া রহিয়াছে। লিপি না থাকার ফলে এই সকল প্রাচীন অলিখিত সাহিত্যিক নিদর্শন বহির্জগতে উপস্থিত করা সম্ভব হয় নাই। ইদানীং আদিবাসী-সমাজে প্রচলিত লোকগাথা ইত্যাদি বাঙলা অক্ষরে ছাপাইয়া প্রকাশের ব্যবস্থা হইতেছে। প্রধানতঃ সরকারী উদ্যমে ত্রিপুরা, লুসাই, রিয়াং প্রভৃতি নৃত্য ও সঙ্গীত উজ্জীবনের চেষ্টা চলিতেছে। নিচে ত্রিপুরার লোক-সঙ্গীতের একটি নমুনা উদ্ধৃত করা হইল :

"হাতুদক্ কলক্ মাইসুই পিংজাগই—
পাগড়ী নুরুগ্‌লিয়া, যাদু পাগড়ী নুরুগ্‌লিয়া।
হাতুদক্ কলক্ গুন্‌যু পিংজাগই—
য়াকুরাই নুরুগ্‌লিয়া, যাদু য়াকুরাই নুরুগ্‌লিয়া।
তুইগেরেং গেরেং গাতি চাক্‌জাগই—
রিহিনই খনালিয়া, যাদু রিহিনই খনালিয়া।
গাতি হলংসা বাংমানি বাগই—
রুকথারই সলাপ্‌লিয়া, যাদু রুকথারই সলাপ্‌লিয়া।
মাইসিংসিয়ারী বাংমানিবাগই—
নাহারই নুরুগ্‌লিয়া, যাদু নাহারই নুরুগ্‌লিয়া।"

( শ্রীসমরেন্দ্র দেব বর্মণ-কৃত বঙ্গানুবাদ : )

"দীর্ঘ পার্বত্য পথে কাওন বপন করাতে
( তাহার ) পাগড়ী দেখিতে পাইলাম না।

দীর্ঘ পার্বত্য পথে দুপাটি ফুলের গাছ বপন করাতে
( তাহার ) গোড়ালি দেখিতে পাইলাম না।
কল কলনাদিনী ঝরণার ধারে ঘাট প্রস্তুত করাতে
ডাকিলেও ( সে ) শুনিতে পাইল না।
ঘাটে অনেকগুলি পাথর থাকাতে
দৌড়িয়াও ( তাহার নিকট ) পৌঁছিলাম না।
কুয়াসার আধিক্যে
চেয়েও ( তাহাকে ) দেখিতে পাইলাম না।"

বিভিন্ন আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে "তুন্দুর", "চম্প্রেং" ইত্যাদি নানাজাতীয় বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার প্রচলিত আছে। উৎসাহের অভাবে এই সকল বাদ্যযন্ত্র ক্রমশঃ লুপ্ত হইয়া যাইতেছে।

মাতৃভূমির মত মাতৃভাষার প্রতি অনুরাগ প্রত্যেক মানুষের সহজাত। ত্রিপুরার লোকগাথা ইত্যাদি ত্রিপুরা ভাষাকে আশ্রয় করিয়াই লিখিত সাহিত্যের মর্যাদা পাইতে পারে। এই কারণে ত্রিপুরার এই নিজস্ব ভাষা-সম্পদকে সযত্নে প্রতিপালন করা প্রয়োজন। ইহা অবশ্য স্বীকার্য যে, কোন ভাষাই নিজের অন্তর্নিহিত শক্তি ছাড়া শুধু মাত্র বাহিরের সাহায্যে সমৃদ্ধি লাভ করিতে পারে না। ইহা ছাড়া মাত্র সোয়া লক্ষ লোকের ব্যবহৃত ভাষার পক্ষে বিকাশ লাভের কতটুকু সুযোগ রহিয়াছে, তাহাও বিচার্য। তথাপি ত্রিপুরা ভাষার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে একেবারে নিরাশ হইবার কোন কারণ নাই। প্রসঙ্গতঃ মনে রাখা প্রয়োজন যে, কোন ভাষাই একক ভাবে পূর্বাপর স্থির হইয়া থাকে না—নানা মানুষের সঙ্গে নিত্য যোগাযোগের মধ্য দিয়া পার্শ্ববর্তী সমৃদ্ধ ভাষাগুলি

হইতে নিয়ত শব্দাদি গ্রহণ করে। ত্রিপুরা ভাষাও প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক যুগে সংস্কৃত, বাঙলা, আরবী, ফার্সি, ইংরেজী প্রভৃতি ভাষা হইতে বহু উপযোগী শব্দ গ্রহণ করিয়াছে। তাই আজকাল আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও রাজনীতির জটিল বিষয়গুলি সম্পর্কেও ত্রিপুরা ভাষায় সহজ ভাবে আলোচনা করা যায়। উপযুক্ত রাষ্ট্রীয় সাহায্য পাইলে ভবিষ্যতে এই ভাষা আরও উন্নতি লাভ করিতে পারে। ত্রিপুরা ভাষার ব্যাকরণ ইতিমধ্যেই রচিত হইয়াছে। কয়েকটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠান নিয়মিত ভাবে এই ভাষা শিক্ষা-দানের ব্যবস্থাও করিয়াছেন। ত্রিপুরার শিক্ষা বিভাগ কোন কোন ক্ষেত্রে ত্রিপুরা ভাষা-শিক্ষা বাধ্যতামূলক করিয়া দিয়াছেন। ইহা সুখের কথা সন্দেহ নাই। এই দিকে ধীর ও সুচিন্তিত ভাবে অগ্রসর হইলে সুফল পাওয়া যাইবে আশা করা যায়।

# দশম অধ্যায়

## পুনর্গঠনের পথে

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করে। ইহার দুই বৎসর পর, ১৯৪৯ সালের অক্টোবর মাসে ত্রিপুরা ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয়। সুদীর্ঘ কাল পর বদ্ধ জলাশয়ের সঙ্গে গতি-চঞ্চল নদীস্রোতের সংযোগ ঘটিল। রাজতন্ত্রের স্থিতিশীলতায় যুগ যুগ ধরিয়া যে জনজীবন আবদ্ধ ছিল, ভারতবর্ষের জাতীয়-জীবনের মূলধারার সঙ্গে যুক্ত হইয়া তাহা এক নূতন চেতনায় উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। রাজার একচ্ছত্র শাসনে যাহারা অভ্যস্ত ছিল, তাহারা ভোটাধিকার লাভ করিল—এই অধিকার প্রয়োগ-পূর্বক স্বাধীন ভারতবর্ষের সর্বোচ্চ আইনসভায় নিজেদের প্রতিনিধি নির্বাচিত করিয়া পাঠাইল। স্থানীয় শাসন ব্যাপারে মুখ্য শাসন-কর্তাকে ( চিফ কমিশনার ) পরামর্শদানের উদ্দেশ্যে বে-সরকারী নেতৃবর্গকে লইয়া গঠিত হইল **উপদেষ্টা পরিষদ**। উপদেষ্টা পরিষদের সীমাবদ্ধ ক্ষমতা-প্রাপ্তিতে কেহ কেহ অবশ্য সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না। কিন্তু জনপ্রতিনিধি-মূলক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পথে ইহা যে একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ, ইহা অস্বীকার করার উপায় নাই। ভারত-ভুক্তি এবং উপদেষ্টা পরিষদ-গঠনের পর আরও কয়েক বৎসর অতিবাহিত হইল। ইতিমধ্যে ভারতীয় রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটিল। ১৯৫৬ সালের আঞ্চলিক পরিষদ আইন অনুসারে ত্রিপুরায় ৩০ জন সদস্যবিশিষ্ট **আঞ্চলিক পরিষদ** গঠিত হইল। পরে আরও দুইজন সদস্য মনোনীত হইলেন।

শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য ইত্যাদি বিষয়ে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতা লইয়া ১৯৫৭ সালের ১৫ই আগস্ট আনুষ্ঠানিক ভাবে পরিষদের উদ্বোধন হইল।

নূতন অবস্থায় শুধুমাত্র শাসন-পরিচালনার ক্ষেত্রে পরিবর্তন আসে নাই—সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও আলোড়ন জাগিয়াছে। প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা-ভুক্ত বিভিন্ন উন্নয়ন-মূলক কর্মসূচীর মধ্যে জনসাধারণের এই নবলব্ধ সামাজিক ও অর্থনৈতিক চেতনার প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়।

রাজ্য হিসাবে ত্রিপুরা শুধু আয়তনের দিক হইতে ক্ষুদ্র নয়—দরিদ্রও। ১৯৫০ সাল, অর্থাৎ ভারত-ভুক্তির পরবর্তী বৎসর হইতে ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত রাজ্যের আয়ের হিসাব লইলে দেখা যায় যে, ঐ সময়ের মধ্যে গড় বাৎসরিক আয়ের পরিমাণ ছিল মাত্র সাতাশ লক্ষ টাকা। অথচ আমরা দেখিয়াছি, একমাত্র সরকারী কর্মচারীদের মূল বেতন হিসাবেই রাজ্য সরকারকে প্রতিবৎসর ৪৯ লক্ষ টাকা ব্যয় করিতে হয়। ১৯৫৩-৫৪ সালে রাজস্ব আদায় হইয়াছিল ২৭,৭৬,০০০ টাকা; পক্ষান্তরে ব্যয় হইয়াছে প্রায় তিন কোটি টাকা। বলা বাহুল্য, এই বাড়তি ব্যয় কেন্দ্রীয় সরকার বহন করেন। সহজতর ভাষায় বলিলে কথাটা দাঁড়ায় এই: ত্রিপুরার উন্নতির জন্য বোম্বাই, পশ্চিমবঙ্গ প্রভৃতি ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যের জনসাধারণ অর্থ জোগাইতেছে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় ইহা স্বাভাবিক।

প্রশাসনিক নানাবিধ অসুবিধার জন্য ত্রিপুরায় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কাজ প্রকৃতপক্ষে ১৯৫২-৫৩ সালে সুরু হয়। প্রথম

পরিকল্পনায় মোট বরাদ্দ ছিল ২,২৭,৫২,৫০০, (প্রাথমিক হিসাবে ২,২৮,৩০,৫০০) অর্থাৎ প্রায় আড়াই কোটি টাকা। আপাতদৃষ্টিতে এই অংকের পরিমাণ সামান্য মনে হইলেও পূর্বাঞ্চলের রাজ্যসমূহের মধ্যে পরিকল্পনা-বাবদ মাথাপিছু ব্যয়ের দিক হইতে পশ্চিমবঙ্গের পরই ত্রিপুরার স্থান। নিচের হিসাব হইতে এই কথার সত্যতা বুঝা যাইবে ঃ

| রাজ্য | মাথা-পিছু ব্যয়ের পরিমাণ |
|---|---|
| পশ্চিমবঙ্গ | ৩০·৫৯ |
| আসাম | ২৩·৫৩ |
| বিহার | ১৫·৪৯ |
| উড়িষ্যা | ১২·১৩ |
| মণিপুর | ১৭·৬৬ |
| ত্রিপুরা | ৩০·৩২ |

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পবিকল্পনা-কালে দুইটি ক্ষেত্রে উন্নতির কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। ইহাদের একটি যোগাযোগ, অপরটি শিক্ষা।

১৯৩৭ সালের পূর্ব পর্যন্ত ত্রিপুরায় আধুনিক সড়কের অস্তিত্ব একেবারেই ছিল না বলা যায়। মহারাজ বীরবিক্রমের রাজত্বকালে নিযুক্ত উন্নয়ন কমিটি ১৯ বৎসরে পথঘাট-নির্মাণ ও রেলপথ-স্থাপনের উদ্দেশ্যে যথাক্রমে সাড়ে বার লক্ষ ও তের লক্ষ টাকা ব্যয়ের পরিকল্পনা গ্রহণ করে। দেশবিভাগের পর যোগাযোগ-সমস্যা আরও তীব্র আকারে দেখা দেয়। ভারতবর্ষের অন্যান্য অংশের সঙ্গে স্থলপথে যোগসূত্র যেমন ছিন্ন হয়, তেমনি রাজধানী

আগরতলার সঙ্গে বিভাগীয় শাসন-কেন্দ্রগুলির যোগাযোগ-ব্যবস্থাও ভাঙ্গিয়া পড়ে। এই অবস্থায় প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় রাস্তাঘাট-নির্মাণের উপরই যে সর্বাধিক জোর দেওয়া হইবে, তাহাতে আশ্চর্যের কিছু নাই। মোট প্রায় আড়াই কোটি টাকার মধ্যে আলোচ্য খাতে বরাদ্দ ব্যয়ের পরিমাণ ছিল প্রায় দেড় কোটি টাকা।

বিগত প্রায় ছয় বৎসরে ত্রিপুরার যোগাযোগ-ব্যবস্থা প্রভূত উন্নতি লাভ করিয়াছে। আগরতলা হইতে আসামের সীমান্ত পর্যন্ত ১২৫ মাইল দীর্ঘ পার্বত্য পথ-নির্মাণ এই সময়ের সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য কীর্তি। ইহা আসামের সঙ্গে ত্রিপুরার সংযোগ সাধন করিয়া এই অরণ্য-রাজ্যের নিঃসঙ্গতা ঘুচাইয়াছে। আগরতলা হইতে এখন প্রায় প্রতিটি বিভাগীয় কেন্দ্রে মোটরযোগে যাওয়া যায়। ত্রিপুরা প্রশাসন কর্তৃক প্রকাশিত তথ্য হইতে জানা যায় যে, ১৯৪৮ সালে সমগ্র রাজ্যে মাত্র ৩৪,৮৮০ গ্যালন পেট্রল ব্যবহৃত হইয়াছিল। ১৯৫৩ সালে এই পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া প্রায় দুই লক্ষ গ্যালনে দাঁড়ায়। এই পেট্রলের অধিকাংশই যে যানবাহন-চলাচলের কাজে লাগিয়াছে, তাহা নিঃসন্দেহে ধরিয়া লওয়া যায়।

শিক্ষাক্ষেত্রেও প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে ত্রিপুরা নিতান্ত পশ্চাৎপদ ছিল। নানা প্রতিকূলতা সত্ত্বেও শিক্ষার উন্নতি-কল্পে বিগত কয়েক বৎসরে যে কাজ হইয়াছে, তাহা সত্যই বিস্ময়কর। উদাহরণস্বরূপ প্রাথমিক শিক্ষার কথাই উল্লেখ করা যায়। ১৯৪৯-৫০ সালে ত্রিপুরায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল চারিশতেরও কম। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শেষে এই সংখ্যা ৯১৪-তে দাঁড়ায়। সর্বশেষ (জানুয়ারী, ১৯৫৮) হিসাব অনুসারে মোট প্রাথমিক

বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৯৬২। প্রথম পরিকল্পনা-শেষে ৬-১১ বৎসর বয়স্ক বালক-বালিকাদের শতকরা প্রায় চল্লিশ ভাগ শিক্ষালাভের সুযোগ লাভ করে। দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে এই শতকরা হার বৃদ্ধি পাইয়া ষাটে দাঁড়াইবে। মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রেও অনুরূপ সাফল্য অর্জিত হইয়াছে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা-ভুক্ত বিভিন্ন উন্নয়ন-কার্যসূচীর মধ্যে আগরতলা কারু-বিদ্যালয়ের ( Polytechnic ) নাম উল্লেখযোগ্য। এই কারিগরী শিক্ষণ-কেন্দ্রে মেকানিক্যাল ও সিভিল ইঞ্জিনীয়ারিং শিক্ষা দেওয়া হইবে। বর্তমানে সুদক্ষ ইঞ্জিনীয়ার প্রভৃতি রাজ্যের বাহির হইতে সংগ্রহ করিতে হয়। নানা কারণে এই ব্যাপারে সরকারকে প্রভূত অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হয়। 'পলিটেকনিক'-প্রতিষ্ঠার ফলে বহুলাংশে এই সমস্যার সমাধান হইবে।

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা দ্বারা শিক্ষাক্ষেত্রে যে সাফল্যলাভ হইয়াছে, দ্বিতীয় পরিকল্পনায় তাহা আরও সুসংহত রূপ লইবে এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন ধারাব সঙ্গে ত্রিপুবাবাসীদের নিবিড়তর পরিচয় সাধিত হইবে। নিচে দ্বিতীয় পরিকল্পনায় বিভিন্ন রাজ্যে শিক্ষা-খাতে মাথাপিছু ব্যয়-বরাদ্দের তুলনামূলক চিত্র দেওয়া হইল :

| | | |
|---|---|---|
| পশ্চিমবঙ্গ | ... | ৮·৫৭ |
| আসাম | ... | ৭·৮৮ |
| বিহার | ... | ৫·৯০ |
| উড়িষ্যা | ... | ৪·২২ |
| মণিপুর | ... | ৯·৮৭ |
| ত্রিপুরা | ... | ১৯·৩৩ |

অন্যান্য ক্ষেত্রে যে উন্নতি সাধিত হইয়াছে, বর্তমান প্রসঙ্গে তাহার বিস্তৃত বিবরণ দেওয়ার সুযোগ নাই। এই অধ্যায়ের শেষে ( পরিশিষ্ট—ক ) প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় মোট বরাদ্দ ও ব্যয়ের হিসাব পাওয়া যাইবে। এই স্থলে একটি বিষয় তথাপি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। ত্রিপুরায় তৈল, কয়লা ও বিদ্যুতের অভাবের কথা ইতিপূর্বে বলা হইয়াছে। ইহাদের অভাবে রাজ্য মধ্যে যন্ত্রশক্তির পূর্ণপ্রয়োগ সম্ভব নয়—আর যন্ত্রের প্রয়োগ ছাড়া অর্থনৈতিক পুনর্গঠন যে অসম্ভব, তাহা বিশ্লেষণ করিয়া বুঝাইতে হয় না।

সম্প্রতি ভারত সরকারের কেন্দ্রীয় জল ও বিদ্যুৎ-সংস্থার একটি বিশেষজ্ঞ দল গোমতী ও খোয়াই নদীতে দুইটি হাইড্রো-ইলেকট্রিক প্রজেক্ট নির্মাণের সম্ভাব্যতা সম্পর্কে অনুসন্ধান-কার্যে লিপ্ত রহিয়াছেন। বিদ্যুৎ-উৎপাদন ছাড়া সেচ-ব্যবস্থার উন্নয়ন ও বন্যা নিরোধও তাঁহাদের তদন্ত-কার্যের অন্তর্ভুক্ত। ডম্বুরু প্রপাত এবং খোয়াই নদীতে জলবিদ্যুৎ-কেন্দ্র স্থাপিত হইলে যথাক্রমে ১৫,০০০ কিঃ ওয়াট এবং ৬,০০০ কিঃ ওয়াট বিদ্যুৎ-উৎপাদন সম্ভব হইবে বলিয়া বিশেষজ্ঞ মহল অনুমান করেন। এই প্রচেষ্টা সার্থক হইলে ত্রিপুরার সমাজ-জীবনে যুগান্তকারী পরিবর্তন সাধিত হইবে।

ক্ষুদ্র ত্রিপুরার বুকে আজ বিরাট আশা। এই প্রাচীন অরণ্য-রাজ্যের গ্রাম • ও শহরে তাই এত উন্মাদনা—এত চাঞ্চল্য। পিলসুজের গাত্র বাহিয়া যুগ যুগ ধরিয়া শুধু ক্লেদই গড়াইয়া পড়িয়াছে—উপরের দীপালোক নিচের নীরন্ধ্র অন্ধকারের বুকে নিয়ত প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। এতকাল পরে সুদীর্ঘ রাত্রির অবসান সমাগত—এবার উদার-অভ্যুদয়ের পালা।

# পরিশিষ্ট—ক *

## প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা

| | বরাদ্দ ( টাকা ) | ব্যয় ( টাকা ) |
|---|---|---|
| কৃষি | ৭,৯৪,০০০ | ৩,৩৬,০০০ |
| পশুপালন | ৪,৫৮,০০০ | ২,৩৪০০০ |
| মৎস্যচাষ | ১,৩৭,০০০ | ১,০৫,০০০ |
| বন | ১০,৯৮,০০০ | ৭,৪২,০০০ |
| সমবায় | ১,৭৪,০০০ | ৫৫,০০০ |
| বিদ্যুৎ | ৭,০০,০০০ | ৫,৩৫,০০০ |
| কুটিরশিল্প | ৭,৮০,০০০ | ৫, ৯,০০০ |
| যোগাযোগ | ১,২৮,০০,০০০ | ৭২,০০,০০০ |
| চিকিৎসা | ২৩,১৮,০০০ | ১১,৬৪,০০০ |
| জনস্বাস্থ্য | ৫,০১,০০০ | ৩,৪৮,০০০ |
| শিক্ষা | ৩০,৩১,০০০ | ১৪,৩৮,০০০ |
| | ২,২৭,৫১,০০০ | ১,৩০,৪৪,০০০ |

* ত্রিপুরা প্রশাসন কর্তৃক প্রকাশিত "সমৃদ্ধির পথে ত্রি ( জানুয়ারী, ১৯৫৭ ) হইতে উদ্ধৃত

# পরিশিষ্ট—খ*

## দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা

| বিষয় | মোট বরাদ্দ | ব্যয় ( লক্ষ টাকার হিসাবে ) | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ১৯৫৬-৫৭ | ১৯৫৭-৫৮ বাজেট | ১৯৫৭-৫৮ সংশোধিত | ১৯৫৮-৫৯ প্রস্তাবিত |
| কৃষি ... ... ... | ৩১·০০ | ২·৪৩৫ | ৮·১২৯ | ৮·২০০ | ৯·৫১৩ |
| ক্ষুদ্র সেচ ... ... ... | ৪·৬০ | ০·৫০০ | ১·৫০০ | ১·৫০০ | ০·৯৭৩ |
| পশুপালন ... ... ... | ৯·৯০ | ০·৪৩৬ | ১·২০১ | ১·১৬১ | ৫·৯৫৯ |
| গব্য উৎপাদন ও দুগ্ধ সরবরাহ ... ... | ১·৯০ | — | ০·২০০ | ১·৪৭৫ | ০·৪০০ |
| বন ও ভূমি সংরক্ষণ ... ... | ১২·১০ | ২·৪৪০ | ৩·২৭২ | ৩·৪৩৯ | ৩·১৩৭ |
| মৎস্য চাষ ... ... ... | ৪·৬০ | ০·১২০ | ০·৯৮৩ | ১·৩৯৮ | ০·৯৬১ |
| সমবায় ... ... ... | ১১·৯০ | ০·০২০ | ১·১৮০ | ১·১৩০ | ৫·৩৯০৮ |
| সমাজ উন্নয়ন/জাতীয় সম্প্রসারণ/বিবিধার্থসাধক ব্লকসমূহ | ৫৫·৮০ | ৮·০৮০ | ৯·৩০০ | ১৮·৪১০ | ১৪·৫৬০ |
| বিদ্যুৎ ... ... ... | ৪২·৭৫ | ১·৫৬০ | ১০·০০০ | ৯·৭১০ | ১১·০১০ |
| শিল্প ... ... ... | ৪৭·৫০ | ১·৬৭১ | ৭·১৫৭ | ১৩·১৬৫ | ১২·২৩৭ |
| পথ ... ... ... | ৩০৪·০০ | ৪৮·১৪০ | ২৫·০০০ | ১৩·৭৭০ | ১০৬·৫৭০ |
| শিক্ষা ... ... ... | ১২৩·৫০ | ৬·৯৬২ | ২২·৮৮২ | ২৪·১৬৮ | ৪৭·০৭০ |

[ শেষাংশ পর-পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ]

# ( পরিশিষ্ট খ-এর শেষাংশ )

| বিষয় | মোট বরাদ্দ | ব্যয় ( লক্ষ টাকার হিসাবে ) | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ১৯৫৬-৫৭ | ১৯৫৭-৫৮ | | ১৯৫৮ ৫৯ |
| | | | বাজেট | সংশোধিত | প্রস্তাবিত |
| স্বাস্থ্য ... ... ... | ৭৫·০০ | ৭·০৫০ | ১১·০১০ | ১০·৫৮০ | ৩২·৫০০ |
| গৃহনির্মাণ ... ... ... | ৩·৮০ | ১·২৫০ | ২·৫০০ | ২·৫০০ | ২·৫০০ |
| অনুন্নত শ্রেণীর কল্যাণ : | | | | | |
| (১) তপশিলী উপজাতি কল্যাণ ... | ৭৬·০০ | ১০·৯০৩ | ১৬·১৫০ | ২৮·৫০৭ | ৪৮·০৮৩ |
| (২) তপশিলী জাতি কল্যাণ ... ... | ১·৯০ | ০·২৫০ | ০৪২০ | ০·৪২০ | ০·৪৩০ |
| সমাজকল্যাণ ... ... ... | ১·৭০ | — | — | ০·৩৫৬ | ০·৪৯৬ |
| শ্রমিককল্যাণ ... ... ... | ২·২০ | ০·০৩৯ | ০·০৬১ | ১·৯৬৬ | ০·৮২৬ |
| পরিসংখ্যান ... ... ... | ০·৯০ | — | ০·৩৪০ | ০·২০০ | ০·৩৪০ |
| প্রচার ... ... ... | ২·৬০ | ০·১৬০ | ০·৬১৭ | ১·০০১ | ০·৪০৮ |
| স্বায়ত্তশাসন ও শহর উন্নয়ন ... ... | ৩২·৮০ | ০·৩১৪ | ৭·৯১৪ | ১·৫৬০ | ৭·২৬০ |
| | ৮৪৬·৫৫ | ৯২·৩২৭ | ১২৯·৮২০ | ২৬৩·৯১৬ | ৩০৮·৬৮৩ |

ত্রিপুরা প্রশাসন কর্তৃক প্রকাশিত "সমৃদ্ধির পথে ত্রিপুরা" ( জানুয়ারী, ১৯৫৮) হইতে উদ্ধৃত

# পরিশিষ্ট—গ*

## দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা—বিভিন্ন রাজ্যে মাথাপিছু উন্নয়ন-ব্যয় বরাদ্দ

| | পশ্চিমবঙ্গ | আসাম | বিহার | উড়িষ্যা | মণিপুর | ত্রিপুরা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| কৃষি ও সমাজ উন্নয়ন। | ১৩'৪২ | ১৬'৪৬ | ১১'৮০ | ১০'২১ | ১৮'৯৪ | ২০'৬৩ |
| সেচ ও বিদ্যুৎ | ১২'২৩ | ৪ ৯০ | ১৫'০৫ | ৩৫'৫৫ | ১৮'০৯ | ৬'৩০ |
| শিল্প | ৩'৮১ | ৫'৬৭ | ৩'১৮ | ৫'২৭ | ৪'১১ | ৭'৪৩ |
| যোগাযোগ ও যানবাহন | ৭'৬৬ | ৮'৫১ | ৪'৬৫ | ৪'৪৯ | ৩৬'১৮ | ৪৭'৫৭ |
| শিক্ষা | ৮'৫৭ | ৭'৮৮ | ৫'৯০ | ৪'২২ | ৯ ৮৭ | ১৯'৩৩ |
| স্বাস্থ্য | ৮'০৩ | ৫'৪৮ | ৪'১৩ | ২'৫৯ | ৫'৭৬ | ১১'৭৪ |
| গৃহনির্মাণ | ৩'০৬ | ১'৩৭ | ১'১৮ | ০'৬৫ | ১'৩১ | ০'৫৯ |
| অনুন্নতশ্রেণী-কল্যাণ | ০'৬৭ | ১০'৫০ | ১'৪২ | ২'৫৯ | ১১ ৯৯ | ১২'১৯ |
| সমাজ-কল্যাণ | ০'১৫ | ০'৫৬ | ০'১৬ | ০'২৪ | ০'৩৫ | ০'২৭ |
| শ্রমিক-কল্যাণ | ০'৫৩ | ০'৪২ | ০'১৯ | ০'১৩ | X | ০'৩৬ |
| পরিসংখ্যান | ০'০২ | ০'২২ | ০'১৩ | ০'১৩ | ০'৩৩ | ০'১৪ |
| প্রচার | ০'১৫ | ০'২৬ | ০'১১ | ০'১৯ | ০'৪৯ | ০'৪১ |
| স্বায়ত্তশাসন ও শহর-উন্নয়ন | ০'৬২ | ০'৭৮ | X | ০'১২ | ০'৮২ | ৫'১৩ |
| * | * | * | * | * | * | * |
| মোট | ৬১ ৮১ | ৬৪'০৬ | ৪৮'২৮ | ৬৮'২৬ | ১০৮ ২৪ | ১৩২'৪৮ |

*বিশ্বভারতী কর্তৃক প্রকাশিত Abstract of Economic and Social Statistics of East India হইতে উদ্ধৃত

## সংশোধন-পত্র

| পৃষ্ঠা | অশুদ্ধ | শুদ্ধ |
|---|---|---|
| ২ | আমাদের | আসামের |
| ৫ | শ্রতর্দন | প্রতর্দন |
| ৮ | রাজাদের সময় | রাজাদের সম্পর্কে |
| ২৩ | স্বাভাবতঃই | স্বভাবতঃই |
| | De jure | De facto |
| ৩২ | অতিক্রম করিয়াছে | অতিক্রম করিয়াছ |
| | তোমার পায়ে | তোমার 'পরে |
| ৬৬ | আলোচনা প্রসঙ্গে | আলোচ্য প্রসঙ্গে |
| ১০৬ | গুন্যু | গুন্থু |